হে যুবক
ফিরে
এসো
রবের দিকে
শাইখ খালিদ আর-রাশিদ
জুবায়ের রশীদ
অনূদিত

হে যুবক
ফিরে এসো রবের দিকে

শাইখ খালিদ আর-রাশিদ

জুবায়ের রশীদ
অনূদিত

সূচিপত্র

উৎসর্গ

আল্লামা আবদুল হাই পাহাড়পুরী রহ.

যিনি ছিলেন আমার পিতা শাইখুল হাদীস মুফতী রশীদ আহমদ দা. বা.-এর মাথার মুকুট ও পৃষ্ঠপোষক। যার অকৃত্রিম ছায়া ও পরশে আমার পিতা হয়ে উঠেছেন মহীরুহ। আমাদের পরিবারের যিনি ছিলেন রাহনুমা। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিন। জান্নাতের সুউচ্চ আসনে সমাসীন করুন।

অনুবাদকের কথা

মানব জীবনের ধারাবাহিক কয়েকটি স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো তারুণ্য। জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয় ব্যক্তির যৌবন ও তরুণ সময়ের সফলতা ও ব্যর্থতার আলোকে। ইহলৌকিক ক্ষণস্থায়ী জীবনের শুধু নয়; পারলৌকিক চিরস্থায়ী জীবনের সাফল্যও নির্ভর করে ব্যক্তির তারুণ্যের ওপর।

বৈষয়িক দৃষ্টিকোণের পাশাপাশি বলা চলে এর চেয়েও অধিক ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তরুণ ও যৌবনকালীন সময়কে অত্যধিক মূল্যায়িত করা হয়েছে। একে ঘিরে বর্ণিত হয়েছে প্রভূত ফজিলত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা যুবকদের প্রশংসা করে বলেছেন, 'হে নবী! আপনার নিকট আমি তাদের ইতিবৃত্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি, তারা ছিল কয়েকজন তরুণ। তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান এনেছিল। আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করে দিয়েছি।'[১]

বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম যুবক ও তরুণদের দারুণ স্তুতি গেয়েছেন, তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এক হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাত শ্রেণির কথা উল্লেখ করেছেন, যাদেরকে কেয়ামতের ঘোরতর কঠিন দিনে আল্লাহ তায়ালা আরশের নিচে ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন যেদিন এ ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি শ্রেণি হলো, ওইসব যুবক যাদের তরুণকাল অতিবাহিত হয়েছে আল্লাহর ইবাদতে।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সাত শ্রেণির লোক যাদের আল্লাহ কেয়ামতের দিন আরশের নিচে ছায়া দেবেন; যেদিন তার ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। (১) ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ (২) আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত যুবক (৩) এমন ব্যক্তি যে আল্লাহকে নির্জনে স্মরণ করে এবং তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয় (৪) এমন ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সঙ্গে লেগে থাকে (৫) এমন দুই ব্যক্তি

---

১ সুরা কাহফ: ১৩

যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালোবাসে; (৬) এমন ব্যক্তি যাকে কোনো সম্ভ্রান্ত রূপসি রমণী নিজের দিকে আহ্বান করল কিন্তু সে বলল, আমি আল্লাহকে ভয় করি (৭) এমন ব্যক্তি যে সদকাহ করল এমনভাবে যে, তার বাম হাত জানে না তার ডান হাত কী করে।[২] নিঃসন্দেহে এ হাদিস যুবকদের মর্যাদা ও তারুণ্যের মাহাত্ম্যকে ফুটিয়ে তুলেছে। অধঃপতিত মুসলিম তরুণরা যদি এই একটি হাদিসকে নিয়ে গভীর চিন্তা করত, তাদের সামগ্রিক জীবনের গতিবিধি পরিবর্তন হয়ে যেত। সেই সঙ্গে তারুণ্যের উচ্ছল ও তুফান সময়কে ঘিরে বর্ণিত হয়েছে বহু সতর্কতা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হাশরের ময়দানে মানুষকে পাঁচটি বিষয়ের হিসাব দিতে হবে। এর পূর্বে এক কদমও কেউ অগ্রসর হতে পারবে না। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, যৌবনকাল কীভাবে ব্যয় করেছে।[৩] অপর এক হাদিসে নবীজি পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের পূর্বে মূল্যায়ন করতে বলেছেন। তন্মধ্যে একটি হলো, বার্ধক্য আসার পূর্বে যৌবনকে।[৪]

তারুণ্য ও যৌবনকালে ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নৈকট্য ও অপার সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবকদের ফজিলত বর্ণনার পাশাপাশি অধিক পরিমাণে সতর্কও করেছেন। কেননা, যৌবনকাল হলো রক্ত উষ্ণ করা সময়। যৌবন একটি প্রবল ঝড়ের নাম। এক অপ্রতিরোধ্য শক্তির নাম। কেউ যাকে রুখতে পারে না। দমাতে পারে না কোনো শক্তিই। হৃদয় ও মন যা চায় তাই করে। সে তখন শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। বিবেকের চেয়ে আবেগতাড়িত হয় অধিক। হিতাহিত জ্ঞান থাকে স্বল্প। ফলে অবাধ্যতা ও নাফরমানিতে লিপ্ত হয়ে যায় অতি সহজেই। অন্যায় ও পাপাচারে জড়িয়ে পড়ে সামান্যতেই। শয়তান ও প্রবৃত্তির ধোঁকায় পতিত হয়। বর্তমান সময়ে যা পরিলক্ষিত হচ্ছে চোখের সামনে।

চরম দুঃখজনক হলেও সত্য; আজ মুসলিম উম্মাহর তরুণ প্রজন্ম অতিক্রম করছে ধ্বংস ও পতনের এক নিদারুণ ক্রান্তিকাল। নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতনের চূড়ান্ত সীমা অতিক্রম করে অপেক্ষা করছে কলঙ্কতিলক পরাজয়ের। নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনার অতল গহ্বরে তারা নিমজ্জিত।

---

২ *সহিহ বুখারি*: ৬৮০৬।

৩ *সুনানুত তিরমিজি*: ২৪১৭।

৪ *মুসতাদরাকে হাকিম*: ৭৮৪৬।

অনৈক্য ও আত্মঘাতির বেড়াজালে আবদ্ধ। চিন্তা-চেতনা, মন-মননে দাসত্বের কারাগারে বন্দি। দুনিয়ার মোহ-লালসা এবং বস্তুবাদের রঙিন নেশায় তারা এতই মত্ত যে, বেমালুম ভুলে গেছে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা। ভুলে গেছে উম্মাহর প্রতি তার অপরিসীম করণীয় ও দায়বোধের কথা। ভুলে গেছে নিজেদের গৌরবান্বিত অতীত ইতিহাস ঐতিহ্যের কথা। ভুলে গেছে একদা উম্মাহর বিজয় রচিত হয়েছিল মুসলিম যুবকদেরই হাতে। যুব প্রজন্মই মুসলিম উম্মাহর প্রধান শক্তি ও হাতিয়ার। প্রতিটি জাতিরই প্রধান স্তম্ভ হলো তরুণ ও যুবক প্রজন্ম। সেনাবাহিনী যেমন একটি রাষ্ট্রের প্রধান হাতিয়ার, তেমনি মুসলিম উম্মাহর প্রধান হাতিয়ার হলো তরুণ প্রজন্ম।

আজ পৃথিবীর দিকে দিকে নির্যাতিত হচ্ছে মুসলমান। মুসলমানদের আর্ত-চিৎকারে ভারী হয়ে উঠেছে পৃথিবীর নীলাকাশ। ইথারে কান পাতলে শোনা যায় মুসলিম নারী-শিশুর আর্তনাদ। প্রতিটি জনপদ যেন ভয়াল মৃত্যুপুরী। কিন্তু আজ যদি মুসলিম তরুণ প্রজন্ম নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি সচেতন হতো, নিজেদের গৌরবান্বিত ইতিহাস ঐতিহ্যের প্রতি যদি সজাগ থাকত তাহলে উম্মাহকে অতিক্রম করতে হতো না এই দুঃসময়। যারা একদা নেতৃত্ব দিত, যাদের হুংকারে কেঁপে উঠত পৃথিবীর মহাশক্তিধর রাজা-বাদশাহ পর্যন্ত, যাদের পদধ্বনিতে নড়ে উঠেছে দুনিয়ার দশ দিগন্ত, আজ তারাই হচ্ছে নিপীড়িত। তারাই আজ হয়ে আছে সেবাদাস।
এ মর্মন্তুদ ও করুণ পরিস্থিতি থেকে মুসলিম উম্মাহকে মুক্ত হতে হবে। ফের ঘুরে দাঁড়াতে হবে লজ্জা ও কলঙ্কের কালি মুছে। মাথা উঁচু করে ফের দিতে হবে নারায়ে তাকবিরের ধ্বনি। নির্যাতিত-নিপীড়িত নারী-পুরুষদের উদ্ধার করতে হবে ঐ হিংস্র পশু-হায়েনার কবল থেকে। আর এর জন্য প্রয়োজন দ্বিগুণ প্রস্তুতি ও উপযুক্ত করণীয় নির্ধারণ।

প্রথম করণীয় হলো, মুসলিম তরুণ প্রজন্মকে জাগ্রত হতে হবে। নিজেদের আত্মমর্যাদাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দুনিয়ার উন্মত্ত নেশা, বস্তুবাদের লোভাতুর হাতছানি, পুঁজিবাদের অন্ধত্ব, অবাধ্যতা ও নাফরমানির জাল ছিন্ন করে ফিরে আসতে হবে ইসলামের শাশ্বত আলোয়। শক্তভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে আল্লাহর রজ্জুকে। নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করতে হবে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ। গড়ে তুলতে হবে সুন্দর পাপমুক্ত জীবন। কেননা, পাপ মানুষের ঈমানি ও নৈতিক শক্তিকে নড়বড়ে করে দেয়। শত্রুর সাথে লড়াই করে জিতবার পূর্বেই

ব্যক্তিগতভাবে তাকে পরাজিত করে দেয়। আজ তাই প্রথমে প্রয়োজন তরুণ প্রজন্মের ব্যক্তিত্ব গঠন।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি মুসলিম যুব ও তরুণ প্রজন্মকে স্মরণ করিয়ে দেবে তার কর্তব্যের কথা। উম্মাহর প্রতি তার অপরিসীম দায়বোধের কথা। স্মরণ করিয়ে দেবে হারানো ইতিহাস ঐতিহ্যের কথা। এ গ্রন্থ মুসলিম তারুণ্যকে করে তুলবে অধিকতর সচেতন । তার হৃদয়ে ঈমানের সুবজ বৃক্ষ রোপণ করবে। তার চরিত্রকে করবে সুশোভিত। তার চেতনাকে করবে শানিত। চিন্তাকে করবে চৈত্রের রোদের মতো স্বচ্ছ ও প্রখর।

গ্রন্থটি আরবের বিশিষ্ট আলেম, চিন্তক ও দাঈ শাইখ খালিদ আর-রাশিদ হাফিযাহুল্লাহ কর্তৃক মুসলিম যুবকদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত লেকচার সংকলন। আপন প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের বিশালতায় শাইখ নিজেকে এমন উচ্চতায় নিয়ে গেছেন যে, তার প্রতিটি বক্তব্য, প্রতিটি সেমিনার, প্রতিটি কথা লিখিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে মানুষের হাতে হাতে। অনূদিত হচ্ছে পৃথিবীর বহু ভাষায়। ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ, চলমান ক্রান্তিকাল ও দুর্দশা থেকে উম্মাহর মুক্তির জন্য অহর্নিশ ছুটে চলা আরবীয় এই সিংহশাবক দীর্ঘদিন সৌদি সরকারের অন্যায় রোষানলের শিকার হয়ে জিন্দানখানায় বন্দিজীবন কাটাচ্ছেন। আজ যার প্রয়োজন ছিল মানুষের দ্বারে দ্বারে, মুসলিম তরুণ প্রজন্মের কাঁধে হাত রেখে উম্মাহর বিজয়কে ত্বরান্বিত করা কিন্তু দুঃখজনক হলেও এটিই সত্য, তথাকথিক মুসলিম শাসকদের হাতে আজ তিনি বন্দি। আরব যুবকদের তিনি হৃদয়ের স্পন্দন। পথহারা যুব প্রজন্মের তিনি আশার আলো। দাওয়াত ও কর্মের ময়দানে তিনি এক দ্বীপিত উপমা। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার নিকট আমাদের সতত প্রার্থনা, তিনি যেন উম্মাহর প্রয়োজনে শাইখকে কারাবন্দি থেকে মুক্ত করেন। যেন পথহারা মুসলিম তরুণ প্রজন্মের কর্ণকোহরে আবার বেজে ওঠে তার অতুলনীয় দরদি কণ্ঠ।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার নিকট অগণন শুকরিয়া, তিনি অধমের হাতে গুরুত্বপূর্ণ এ গ্রন্থটি অনুবাদ করিয়েছেন। করোনা ভাইরাসের প্রকোপে যখন সমগ্র দুনিয়া দিশেহারা তখন ঘরে বসে নির্বিঘ্নে মূল্যবান এ খিদমাহ আঞ্জাম দেওয়ার তাওফিক দান করেছেন। অনুবাদ-কর্মটি আমার হাতে অর্পণ করেছেন–হাসানাহ পাবলিকেশন। প্রকাশনীর কর্তা-ব্যক্তিদের দাওয়াতি দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে দারুণ মুগ্ধ করে। পুঁজিবাদের এই নষ্ট সময়ে ক-জন তরুণ তারা ইসলামের সঠিক দাওয়াত মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়ার উপযুক্ত

কর্মপন্থা বেছে নিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাদের দুনিয়া-আখেরাতে সম্মানিত করুন। বইটি সকল পাঠক বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে রাহনুমায়ি করবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস। লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সকলের পরিশ্রম আল্লাহ কবুল করুন। পাঠকের জন্য হেদায়েতের মাধ্যম বানান। আমিন।

মুফতী জুবায়ের রশীদ
মুশরিফ (ইফতা)
মারকাযুল উলুম আল-ইসলামিয়া
উত্তরা, ঢাকা।

হে যুবক! ফিরে এসো রবের দিকে

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

মুসলিম যুব ও তরুণ প্রজন্ম আজ সীমাহীন গাফলতের মাঝে ডুবে আছে। তাদের জীবনকে ঢেকে নিয়েছে উদাসীনতার কুৎসিত চাদর। তাদের মন ও মননকে বড় শক্ত করে পেঁচিয়ে ধরেছে অভিশপ্ততার শৃঙ্খল। পাপ ও নাফরমানির কালো থাবায় আজ তারা জর্জরিত। তাদের চক্ষু থাকলেও তারা দেখতে পায় না সত্যের দিশা। কান থাকলেও তারা শুনতে পায় না হেদায়েতের বাণী। হৃদয় থাকলেও তারা অনুভব করতে পারে না কোথায় রয়েছে তাদের জীবনের প্রকৃত কল্যাণ ও সফলতা। পবিত্র কুরআনের ভাষায় তারা যেন চতুষ্পদ জন্তু। সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে তারা পূর্ণ উদাসীন। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা কেন পাঠিয়েছেন, পার্থিব জীবনের লোভ-লালসা ও অন্ধ মোহ তাদের ভুলিয়ে দিয়েছে সে কথা। শয়তানের ধোঁকা ও বস্তুবাদের আগ্রাসনে তারা ভুলে গেছে উম্মাহর প্রতি নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা। তারা ভুলে গেছে মহান রবের প্রতিশ্রুতির কথা।

হে যুবক! উম্মাহর অতন্দ্র প্রহরী! কতদিন এভাবে গাফলতের দরিয়ায় ডুবে থাকবে? কতকাল উদ্ভ্রান্ত হয়ে ফিরতে থাকবে অবাধ্যতার উপত্যকায়? কতকাল বিভোর থাকবে নষ্ট ও ভ্রষ্টতার ঘুমে? কতকাল পান করবে পাপের শরাব? হে যুবক! মৃত্যুর কথা কি তোমার স্মরণ হয় না? তোমার কি মনে পড়ে না আল্লাহর কঠিন শাস্তির কথা? প্রতিদিন অগণিত মানুষের মৃত্যু কি তোমাকে অন্ধকার কবরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় না? বলো, কে আছে

এমন, মৃত্যু যাকে স্পর্শ করবে না? কে আছে এমন যার দুয়ারে এসে আকস্মিক মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে উপস্থিত হবে না মালাকুল মওত?

জেনে রেখো! প্রতিটি মানুষকেই একদিন মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। মৃত্যু এমন এক অপরাজেয়, যার থেকে কেউ কোনোদিন মুক্তি পায়নি। আর কেউই মুক্তি পাবে না। না তুমি, আর না আমি। হে যুবক! তুমি বলো আমাকে, সাদা কাফনে প্যাঁচিয়ে কোথায় রেখে এসেছে তোমার বাবাকে? কোথায় কোন অচিনপুরে মাটিচাপা দিয়ে রেখে এসেছে তোমার মমতাময়ী মাকে? অনুভূতির শক্ত চাবুক দিয়ে করাঘাত করো হৃদয় দুয়ারে। জাগ্রত করো তোমার ঘুমন্ত সত্তাকে। ফিরিয়ে আনো অবাধ্য মনকে পাপের আসর থেকে। জীবন নিছক খেল-তামাশার নাম নয়। জীবন নয় কেবল শরাবের পেয়ালায় চুমুক দেওয়া। জীবনের সূচনা যেমন হয়েছে, তেমনি এর পরিসমাপ্তিও আছে। কোন সে জিনিস যার সূচনা আছে কিন্তু সমাপ্তি নেই? হ্যাঁ, একমাত্র আখেরাত, যার সূচনা আছে কিন্তু সমাপ্তি নেই।

শপথ সে সত্তার যিনি স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আসমান-জমিন! দুনিয়াতে আগত সকল প্রাণী ও মানুষকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। সকলকে প্রবেশ করতে হবে আঁধারঘেরা কবরের গৃহে। কবর প্রতিনিয়ত হাতছানি দিয়ে ডাকছে তোমাকে আমাকে। জীবনের সময় দ্রুতই ফুরিয়ে আসছে। জীবন গলে গলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে বরফের মতো। জীবন একটি খরগোশ যে ক্রমাগত মৃত্যুর দিকে দৌড়াচ্ছে।

আমি একটি উপমা পেশ করছি, যা তোমার হৃদয়ে রেখাপাত করবে। শক্ত নখরে আঁচড় কাটবে। একদা হযরত ইসা আলাইহিস সালামের সামনে দুনিয়াকে এক বৃদ্ধা নারীর বেশে হাজির করা হলো। আর তাকে সাজানো হয়েছে সকল প্রকার সৌন্দর্য দিয়ে। হযরত ইসা আলাইহিস সালাম কোমল কণ্ঠে সুন্দরী বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কতজন পুরুষের সাথে তোমার বিয়ে হয়েছে?' বৃদ্ধা জবাব দিলো, 'অনেক পুরুষের সাথেই আমার বিয়ে হয়েছে।' হযরত ইসা আলাইহিস সালাম পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে তোমার সেসব স্বামীরা কোথায়? তারা কি সবাই মৃত্যুবরণ করেছে নাকি তারা তোমাকে তালাক দিয়েছে?' বৃদ্ধা বলল, 'না, তাদের কেউ আমাকে তালাক দেয়নি। বরং তাদের সকলকে আমি হত্যা করেছি।' এ কথা শুনে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম ভারি দুঃখবোধ করলেন। এবং বললেন, 'তাহলে বর্তমানে যে তোমার বিবাহাধীন রয়েছে সে কেন পূর্ববর্তীদের থেকে

শিক্ষাগ্রহণ করে না? তার অন্তরে কি নৃশংস মৃত্যুভয় জাগ্রত হয় না? তাহলে সে তো বড্ড নির্বোধ আর বোকা।'

দুনিয়ার লোকদের অবস্থা বৃদ্ধা মহিলার সে স্বামীর মতো, যে প্রতিনিয়ত অসংখ্য মানুষের মৃত্যু দেখেও হৃদয়ে তার মৃত্যুভয় জাগ্রত হয় না। অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কথা ভেবে চিন্তিত হয় না। এর থেকে উত্তোরণের কোনো উপায় সে খুঁজে বের করে না।

সুতরাং হে গাফেল! হে ঈমান ও আমল সম্পর্কে উদাসীন ব্যক্তি! হে দুনিয়ার মোহ ও লালসায় আশান্বিত ব্যক্তি! ফিরে এসো। ফিরে এসো গাফলতের আবরণ ভেঙে। জীবনকে গ্রহণ করো মুসাফিরের মতো। দুনিয়ার জীবনকে বানাও আখেরাতের পাথেয়। জীবন আছে যতদিন, কেবল পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণ করো। আমলকে তোমার প্রিয়তম বন্ধু বানাও। আল্লাহর আনুগত্যকে বানাও উত্তম সঙ্গী। জিকির ও আলেমদের মজলিসকে গ্রহণ করো যাপিত জীবনের অবারিত সুযোগ হিসেবে। জেনে রেখো! অকস্মাৎ একদিন জীবনের দুয়ারে এসে হাজির হবে মৃত্যু। জেনো! সেদিন কেউ পলায়ন করতে পারবে না মৃত্যুর ভয়ংকর থাবা থেকে। তাই হে গাফেল! সময় থাকতে সতর্ক হও। সময় থাকতে ফিরে এসো রবের দিকে।

তারুণ্য উম্মাহর প্রাণশক্তি

কোনো জাতির ভাগ্য নির্ধারণ হয় সে জাতির যুব ও তরুণ প্রজন্মের শক্তি, সাহস, চিন্তা-চেতনা, তাদের কর্মক্ষমতা, দক্ষতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে। তারুণ্য একটি জাতির প্রাণশক্তি। একটি জাতির মেরুদণ্ড। তারুণ্যের উপমা হলো সূর্যের সাথে। সূর্য যেমন দিবসের শুরুতে আগুনের মতো জ্বলতে থাকে মধ্য আকাশে আর দিবসের শেষে তা স্তিমিত হয়ে আসে, তেমনি যুবক ও তরুণ প্রজন্ম হলো একটি জাতির সূর্য। তারা তাদের শক্তি সাহস ও বুদ্ধি দিয়ে জয় করে সকল কিছু। সূর্যের আলোয় যেমন সমগ্র পৃথিবী আলোকিত হয়ে ওঠে, তেমনি যুবকদের শক্তিতে পৃথিবীর বুকে কোনো জাতির দখল ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যুবক ও তরুণদের উপমা হলো সিংহের সাথে। সিংহের সাহস ও গর্জনের যেমন মূল্য দেওয়া যায় না জবাই করা বকরির মূল্যের মতো, তেমনি যুবকরা হলো একটি জাতির সিংহ। তাদের শক্তি ও বীরত্বের কোনো তুলনা হতে পারে না।

যুবসমাজ হলো অপ্রতিরোধ্য ও অজেয়। ক্লান্তি তাদেরকে স্পর্শ করে না। রাত-দিনের ক্রমাগত পরিশ্রমে তারা ভেঙে পড়ে না সমাজের বৃদ্ধদের মতো। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছা পর্যন্ত কোনো শক্তিই তাদের থামিয়ে দিতে পারে না। অপ্রতিরোধ্য হ্রেষাধ্বনি ছড়িয়ে তারা ছুটতে থাকে দিগ্বিজয়ী বীরের বেশে। মৃত্যুভয় তাদের ভীত করে না। শত্রুর শানিত তরবারির আঘাত তাদের চিন্তিত করে না কখনো। মৃত্যুকে যারা জয় করেছে তারাই পারে বিজয়ের ফুলেল মাল্য অর্জন করতে।

মুসলিম উম্মাহর শক্তির কেন্দ্রবিন্দু হলো তরুণ ও যুব শ্রেণি। ইতিহাসের পাতায় গভীরভাবে তাকালে দেখা যায় যে, মুসলিম উম্মাহর বিজয় সূচিত হয়েছে তরুণদের রক্ত ও শ্রমের বিনিময়ে। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী করার পেছনে মূল নিয়ামক শক্তি ছিল মুসলিম যুব ও তারুণ্য। কারণ তাদের বাহুতে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা দিয়েছেন শত্রুকে কুপোকাত করার অদম্য শক্তি। তাদের শিরায় দিয়েছেন অপ্রতিরোধ্য ধমনী। তাদের অন্তরে দিয়েছেন ইসলামের জন্য অপরিসীম আবেগ।

ইতিহাসের পাতায় সাহাবায়ে কেরামের অবদান লেখা আছে স্বর্ণাক্ষরে। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারপাশে থেকে যারা রণাঙ্গনে রক্ত ঝরিয়েছেন, ছিনিয়ে এনেছেন বিজয়ের মাল্য তাদের

অধিকাংশই ছিল তরুণ। সকল যুদ্ধে তারা নবীজিকে সাহায্য করেছেন। ইসলামের জন্য তাদের ছিল অসামান্য ভূমিকা। আল্লাহ ও তার রাসুলের জন্য ছিল হৃদয়ে অফুরন্ত আবেগ। যার ফলে জীবন ছিল তাদের নিকট অতি তুচ্ছ। রক্ত ছিল তাদের নিকট নগণ্য। তাদের নিকট ইসলামই ছিল একমাত্র বিষয়। পৃথিবীর বুকে ঈমানের পতাকা উঁচু করাই ছিল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আদেশ করেছেন আর অমনি তারা বাঁজপাখির মতো ছুটে গিয়েছেন রণাঙ্গনে। ঝাঁপিয়ে পড়েছেন শত্রুদলের ওপর। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাদের রক্ত ও ঘামে উম্মাহকে বিজয় দান করেছেন।

হে তরুণ! হে উম্মাহর প্রাণশক্তি! তোমাকে বলছি শোনো! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয় করে যখন বীরের বেশে কাবা নগরীতে প্রবেশ করেন তখন উটের পেছনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কে বসা ছিল জানো? কে সেদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উটের পেছনে জড়িয়ে ধরেছিল? হ্যাঁ, তিনি একজন যুবক! একজন সাহসী তরুণ সাহাবি! তিনি হলেন হযরত উসামা রা.। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের জন্য শক্তিশালী প্রস্তুতি নিয়ে রওনা করেছিলেন আর তার পেছনে সাহায্যকারী হিসেবে বসিয়েছিলেন হযরত উসামা রা.-কে। তার বয়স তখনো বিশ অতিক্রম করেনি। টগবগে এক তরুণ। চোখে-মুখে তার অপরিসীম আবেগ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রা.-কে বলেছেন, হে আয়েশা! তুমি উসামাকে ভালোবাসো কারণ আমি তাকে ভালোবাসি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওসামা রা.-কে যুদ্ধের সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। অথচ তার বয়স তখনো বিশ অতিক্রম করেনি। সদ্য প্রস্ফুটিত এক যুবক। সাহস যার শরীরে টগবগ করছে। যার ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে উষ্ণ রক্তের শিরা। যার বাহু শক্তিতে ভরপুর। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসামা রা.-এর মতো একজন যুবককে যুদ্ধের সেনাপতি নিযুক্ত করেছেন, অথচ তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উপস্থিত ছিলেন হযরত আবু বকর রা.-এর মতো প্রবীণ সাহাবিগণ। হযরত উমর রা.-এর মতো সাহসী ব্যক্তিবর্গ, যারা ছিলেন বিশ্বস্ত ও ইসলামের জন্য নিবেদিত। যাদের রক্ত ও ঘামের ওপর সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে ইসলাম। কিন্তু তাদের সেনাপতি নিযুক্ত না করে একজন যুবককে

যুদ্ধের সেনাপতি নিযুক্ত করেছেন। উম্মাহর তরুণ প্রজন্মের প্রতি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছিল অকুণ্ঠ সমর্থন। শুধু তাই নয়, সবাইকে সতর্ক করে বলে দিয়েছেন, কেউ যেন হযরত উসামার সেনাপতিত্বের বিরুদ্ধাচারণ না করেন। যদি কেউ হযরত উসামার সাথে বিরুদ্ধাচরণ করে তাহলে সে যেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন এমন কঠিন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন যেন সকলে হযরত উসামা রা.-এর নেতৃত্ব মেনে নেয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশঙ্কা ছিল হয়তো বয়সে তরুণ হওয়ার কারণে কেউ কেউ হযরত উসামা রা.-এর নেতৃত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করবে। কিন্তু সেনাপতি হিসেবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দ ছিল হযরত উসামা রা.। কারণ, হযরত উসামা রা. ছিলেন একজন তরুণ। তার সাহস ছিল অফুরন্ত। ইসলামের প্রতিটি বিষয়ে তার আনুগত্য ছিল প্রশংসনীয়। আল্লাহর রাসুলের কাছে হযরত উসামা ছিলেন অতি প্রিয় ও বিশ্বস্ত।

এ হলো সেকালের তরুণ ও যুব সমাজের অবস্থা। বর্তমান তরুণ প্রজন্মের অবস্থা কী? আফসোস, কত আফসোস। সেকালের তরুণদের সাথে একালের তরুণদের অবস্থা খুবই করুণ ও মর্মান্তিক। চরম দুঃখজনক হলেও সত্য; আজ মুসলিম উম্মাহর তরুণ প্রজন্ম অতিক্রম করছে ধ্বংস ও পতনের এক নিদারুণ ক্রান্তিকাল। নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতনের চূড়ান্ত সীমা অতিক্রম করে এখন অপেক্ষা করছে কলঙ্কতিলক পরাজয়ের। নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত তারা। অনৈক্য ও আত্মঘাতির বেড়াজালে আবদ্ধ। চিন্তা-চেতনা, মন-মনন দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দি। দুনিয়ার মোহ-মায়া এবং বস্তুবাদের রঙিন নেশায় তারা এতই মত্ত যে, বেমালুম ভুলে গেছে আপন দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা। ভুলে গেছে উম্মাহর প্রতি তার করণীয়ের কথা। ভুলে গেছে নিজেদের গৌরবান্বিত অতীত ইতিহাস। ঐতিহ্যের কথা। ভুলে গেছে একদা উম্মাহর বিজয় রচিত হয়েছিল মুসলিম যুবকদেরই হাতে। বর্তমান মুসলিম তরুণ প্রজন্ম হারিয়ে গেছে অন্ধকারের চোরাবালিতে। তারা ভুলে গেছে নিজেদের মুসলিম পরিচয়। তাদের জীবন ও চরিত্র ধ্বংস হয়ে গেছে। দিন-রাত তারা ডুবে থাকে অশ্লীলতা ও পাপাচারে। গান-বাদ্য তাদের প্রিয় বিষয়। সকাল-সন্ধ্যা তারা মত্ত থাকে খেলাধূলায়। জীবনের একমাত্র নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের খেলা। আজ মুসলিম যুবকরা মসজিদ ছেড়ে পাড়ি জমিয়েছে খেলার মাঠে। মুসলিম দেশে দেশে আজ নির্মিত হচ্ছে

বড় বড় স্টেডিয়াম। তৈরি হচ্ছে উন্নত মদের আসর। নাটক সিনেমা আর পর্ণগ্রাফিতে আসক্ত হয়ে পড়েছে তারা। পশ্চিমা সভ্যতার অন্ধ অনুকরণে মুসলিম যুবকরা বেড়ে উঠছে। মুসলিম যুবকদের চরিত্র ধ্বংস করার জন্য পশ্চিমা দুনিয়া তাদের ধ্বংসাত্মক বহু কার্যক্রম বাস্তবায়নে উঠেপড়ে লেগেছে। না বুঝে মুসলিম যুবকরা সেসবে আটকে পড়ে হারিয়ে ফেলছে তাদের ঈমান আকিদা। তারা ভুলে যাচ্ছে তাদের অতীত ইতিহাস ঐতিহ্য।

ইসলামের শত্রুরা জানে, মুসলিম যুব ও তরুণ প্রজন্মকে ধ্বংস করতে পারলে ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলা যাবে সহজেই। তারা জানে এ কথা, একটি জাতির মূল চালিকাশক্তি হলো সে জাতির তরুণ শ্রেণি। তাই তারা মুসলিম যুবকদের ধ্বংস করতে মরিয়া হয়ে ওঠেছে। তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলা। আর এর জন্য প্রথমে প্রয়োজন মুসলিম যুবকদের হৃদয় থেকে ইসলামি চেতনাকে বিলুপ্ত করা। যে চেতনার বলে মুসলিমরা একদিন শাসন করেছিল অর্ধ পৃথিবী।

হে মুসলিম যুবক! ফিরে এসো। ফিরে এসো আপন নীড়ে। ফিরে এসো ইসলামের আলোয়। ইসলামের চেতনায় সুন্দর ও সজীব করো তোমাদের জীবন। ইসলামের আদর্শে আদর্শিত হও। হে যুবক! আজ মুসলিম উম্মাহ তাকিয়ে আছে তোমার দিকে। তাকিয়ে আছে তোমার সাহসের দিকে। তোমার চেতনার দিকে। একদিন তুমি ছিলে ইসলামের বিজয়ের মন্ত্র। তোমার রক্তে অর্জিত হয়েছিল উম্মাহর বিজয়। ইসলামের ঝান্ডা উড্ডীন হয়েছিল তোমার বাহুর শক্তিতে। আজ নির্যাতিত উম্মাহ তাকিয়ে আছে তোমার দিকে। তুমি উম্মাহর প্রাণশক্তি। তুমি উম্মাহর সূর্য। তুমি উম্মাহর সিংহ।

তরুণ সাহাবি হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রা.

কোন সে যুবক যে শত্রুর সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়াবে? কোন সে যুবক যে শত্রুর চোখ রাঙানিতে ভীত হবে না? কোন সে যুবক যার হৃদয় ভরপুর ইসলামের শাশ্বত আলোয়? হ্যাঁ, তিনি হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের! রাসুল সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সর্বপ্রথম মদিনায় হিজরত করতে আদেশ করেছেন। প্রাণাধিক প্রিয় রাসুলের আদেশে তাৎক্ষণিক তিনি রাজি হয়ে গেছেন মক্কার আবেগ ও ভালোবাসা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করার জন্য। তখন মক্কা নগরীতে ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর চলছে অমানবিক অত্যাচার। কাফেররা ঝাঁপিয়ে পড়েছে নবাগত মুসলমানদের ওপর। উত্তপ্ত মরুবালিতে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখছে তাদের। পিঠে চাপা দিয়ে দিচ্ছে রোদে পোড়া ভারী পাথর। আহ! সে কী বর্বরতা ছিল মুসলমানদের ওপর। পৃথিবী প্রত্যক্ষ করেছে পাষবিকতার সে করুণ দৃশ্য। ইতিহাস লিখে রেখেছে অত্যাচার নিপীড়নের প্রতিটি বর্ণনা। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রা.-কে আদেশ করলেন মদিনায় হিজরত করার জন্য। মদিনার লোকদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য। মদিনার যে কয়জন নতুন মুসলমান রয়েছে তাদের নামাজ, কুরআনসহ ইসলামের প্রাথমিক বিষয়াদি শিক্ষা দিতে। বিশেষত তাদের কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য নবীজি হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রা.-কে মদিনায় প্রেরণ করেছেন। নবীজির আদেশ সে তো অলঙ্ঘনীয়। জীবনবাজি রেখে হলেও তা বাস্তবায়ন করতে হবে। শরীরের শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো আদেশ অমান্য করেননি সাহাবায়ে কেরাম। আর এজন্যই তারা এ উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।

মুসআব ইবনে উমায়র রা. তখন বিশ না পেরুনো এক টগবগে যুবক। মক্কার সুদর্শন ও আত্মমর্যাদাশীল যুবকদের একজন। জন্মগ্রহণ করেছেন আরবের অভিজাত এক পরিবারে। বংশ ছিল সম্ভ্রান্ত। সম্পদ ও ধনে তার গোত্র ছিল প্রাচুর্যময়। তার জীবন ছিল বিলাসিতা ও ভোগ-বিলাসে ভরপুর। আরবের সবচেয়ে মূল্যবান সুগন্ধি তিনি ব্যবহার করতেন। এমন কোনো মূল্যবান রেশম নেই যা তিনি পরিধান করেননি। জীবনের অগাধ সুখ ও শান্তির মাঝে কাটছিল হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রা.-এর যৌবন। কিন্তু যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন তখনই পাল্টে গেল তার সমস্ত জীবনাচার। তিনি হয়ে

গেলেন অন্য এক মুসআব। এক অন্য যুবক। আগে যিনি পরিধান করতেন আরবের শ্রেষ্ঠ রেশমি পোশাক এখন তিনি পরিধান করেন অতিশয় পুরাতন ছিন্ন ও মলিন কাপড়। আগে যিনি আহার করতেন আরবের শ্রেষ্ঠ সব খাবার এখন তিনি একদিন খেলে আরেকদিন থাকেন উপোস। জীবনে যার শরীরে লাগেনি এক চিলতে আঁচড় এখন তিনি সহ্য করেন স্বগোত্রীয়দের অবর্ণনীয় অত্যাচার। সম্পূর্ণ পাল্টে গেলেন তিনি। এক আরবীয় যুবকের যৌবনের সকল উন্মাদনা বন্ধ হয়ে গেল। ইসলাম তাকে পাল্টে দিয়েছে। রাসুলের চেতনা তাকে বদলে দিয়েছে।

মুসআব ইবনে উমায়ের রা. মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র আমানত নিয়ে তিনি মদিনার পানে রওনা করেন। মক্কায় রেখে গেলেন তার পরিবার পরিজন। সকল মায়া ও ভালোবাসা তুচ্ছ করে তিনি মদিনায় চলে গেলেন। হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রা. যখন হিজরত করেন মদিনায় তখন মাত্র বারজন মুসলমান। তাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি মদিনার সর্বত্র ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন। ইহুদিদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তিনি মদিনার লোকদের মাঝে ঈমানের আলো ছড়াতে থাকেন। তার দাওয়াত এবং অক্লান্ত চেষ্টার ফলে একদিন মদিনার ঘরে ঘরে ইসলামের আলো প্রবেশ করে। হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রা.-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন উসায়দ ইবনে হুযাইর, যার কুরআন তিলাওয়াত শোনার জন্য আকাশ থেকে নেমে এসেছিল ঝাঁকে ঝাঁকে ফেরেশতা। তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন মুয়াজ ইবনে জাবাল রা., যার মৃত্যুতে কেঁপে উঠেছিল আল্লাহর আরশ। হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রা.-এর উত্তম আদর্শ ও জীবনাচার দেখে মদিনার লোকেরা তার দাওয়াত কবুল করতে লাগল। মদিনার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল ইসলামের শাশ্বত আলো।

হে যুবক! মুসআব ইবনে উমায়ের ছিলেন তোমার মতো একজন যুবক। বিশ বছরের এক সুদর্শন যুবক। একজন মুসআব ইবনে উমায়ের পরিবর্তন করে দিয়েছেন গোটা মদিনা। মদিনাকে তিনি আলোকিত করে তুলেছেন কুরআনের আলোয়। হে যুবক! তিনিও তোমার মতো একজন যুবক ছিলেন। যে ইসলাম মুসআব ইবনে উমায়ের তৈরি করেছে সে ইসলাম আজও আছে। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মুসআব ইবনে উমায়ের কিছুই ছিলেন না। ইসলাম তাকে দিয়েছে শ্রেষ্ঠত্বের আসন। সম্মান ও মর্যাদার সুউচ্চ চূড়ায় আসীন

করেছে। আল্লাহর কসম! আজও রয়েছে সে ইসলাম। ইসলামের সে আদর্শ ও চেতনা আজও রয়েছে। হে যুবক! শুধু পরিবর্তনের ইচ্ছে করো। নিজেকে ইসলামের আলোয় আলোকিত করার স্বপ্ন দেখো। ইসলামের রঙে রঙিন করো। তাহলে ইসলাম তোমাকে কালের মুসআব ইবনে উমায়ের হিসেবে তৈরি করবে। প্রয়োজন কেবল পরিবর্তনের অদম্য ইচ্ছা।

হে যুবক! তোমার কি এখানো সময় হয়নি নিজেকে পরিবর্তন করার? হে যুবক! তুমি যদি মুসলমান হয়ে থাকো তাহলে নিজেকে জিজ্ঞেস করো যে, তুমি আল্লাহ ও তার রাসুলকে ভালোবাসো কি না? যদি তোমার উত্তর হয় হ্যাঁ, তাহলে পার্থিব খেল-তামাশা পরিত্যাগ করার সময় কি তোমার এখনো হয়নি? হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রা. কেন ছেড়ে দিয়েছেন পূর্বপুরুষের সকল রীতি-নীতি? কেন ছেড়ে দিয়েছেন ভোগের জীবন? আয়েশি নরম বিছানা ত্যাগ করে তিনি কেন পছন্দ করলেন পাথুরে বিছানা? কেন হযরত মুসআব পরিত্যাগ করলেন সবকিছু? শুধুমাত্র আল্লাহ ও তার রাসুলকে ভালোবেসেছেন বলে। আল্লাহ ও তার রাসুলের ভালোবাসা তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে পার্থিব জীবনের সকল মোহ ত্যাগ করতে। হে যুবক! তুমি যদি সত্যিই আল্লাহ ও তার রাসুলকে ভালোবাসো তাহলে কেন নিজেকে পরিবর্তন করো না? কেন নিজের অবাধ্য ও নাফরমানির জীবন পরিত্যাগ করো না? আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ
مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ
فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

'আল্লাহর স্মরণ এবং তিনি যে সত্য অবতীর্ণ করেছেন তার কল্যাণে মুমিনদের জন্য কি সময় হয়নি যে, তাদের অন্তর বিনম্র হবে এবং তারা তাদের মতো হবে না যাদের ইতিপূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল অতঃপর বহুকাল অতিক্রান্ত হওয়ায় তাদের অন্তর শক্ত হয়ে গিয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই অবাধ্য।'[৫]

৫সুরা হাদিদ: ১৬

সুতরাং হে যুবক! ফিরে এসো তোমার রবের দিকে। ফিরে এসো তোমার রবের দেওয়া প্রতিশ্রুতির দিকে। ছেড়ে দাও সকল অবাধ্যতা। প্রবৃত্তির অনুসরণ ছেড়ে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রণীত জীবনের দিকে ফিরে এসো। নাফরমানিতে ডুবে থাকবে আর কতকাল? আর কতকাল উপেক্ষা করবে তোমার রবের আহ্বান? অবাধ্যতার পিঞ্জর ভেঙে ফিরে এসো কল্যাণ ও সফলতার পথে।

হে আল্লাহ! হে রাহমানুর রাহিম! আপনি মুসলিম যুব ও তরুণ প্রজন্মকে কবুল করে নিন। তাদেরকে পরিপূর্ণরূপে ইসলামের প্রবেশ করার তাওফিক দান করুন। তাদের অন্তরকে ইসলামের সৌন্দর্য দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দিন। তাদের অন্তরকে ঈমানের আলোয় আলোকিত করে দিন। আপনার রাসুলের আদর্শে তাদের আদর্শবান বানিয়ে দিন। হে আল্লাহ! আপনি যুবকদের অন্তরে ইসলামের জন্য ভালোবাসা ও আবেগ সৃষ্টি করে দিন। ইসলামের জন্য নিজেদের জান ও মাল ব্যয় করার তাওফিক দান করুন। তাদের অন্তর থেকে সকল প্রকার নাফরমানি দূর করে দিন। তাদের আপনার পূর্ণ আনুগত্য করার তাওফিক দান করুন। তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে হেফাজত করুন। তাদের অন্তর থেকে সকল প্রকার মন্দ কামনা-বাসনা দূর করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি মুসলিম যুবকদের আপনার দ্বীনের প্রাণশক্তি হিসেবে কবুল করে নিন। আপনার দ্বীনের বিজয়ের জন্য তাদের আপনি সৈনিক হিসেবে কবুল করে নিন। হে আল্লাহ! মুসলিম যুবকদের মাঝে আপনি হযরত উসামা এবং হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রা.-এর মতো যুবক তৈরি করে দিন।

তারুণ্য উম্মাহর আশার প্রদীপ

এ আলোচনার সারমর্ম হলো ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর মুক্তি লাভ এবং হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে উপযুক্ত করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা। উম্মাহ কীভাবে মুক্তি পাবে? কোন পথে রয়েছে উম্মাহর কাঙ্ক্ষিত সফলতা? কীভাবে আমরা একে অপরকে সৎকাজ এবং তাকওয়া অর্জনে সহযোগিতা করতে পারি? এবং কীভাবে আমরা নিজেদের এবং আমাদের পরিবার-পরিজনকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারি? সে সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করা।

তরুণ ও যুব প্রজন্ম একটি জাতির মেরুদণ্ড। সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণ। তাদের রক্ত ও ঘামের ওপর নির্মিত হয় জাতির সফলতা ও ব্যর্থতা। চলমান নৈরাজ্য এবং পতনের অতল গহ্বর থেকে কোনো জাতিকে টেনে তুলে এনে সফলতার সুউচ্চ চূড়ায় আরোহণ করায় যারা তারা সে জাতির তরুণ প্রজন্ম। পক্ষান্তরে কোনো জাতির তরুণ প্রজন্ম যদি শৃঙ্খলা ও নিজেদের কর্তব্যের কথা ভুলে যায় তাহলে সে জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী। ধ্বংস ও পরাজয়ের হাত থেকে আর কোনো মন্ত্রই তাদের রক্ষা করতে পারে না।

আজ সূর্যের আলোর ন্যায় এ কথা সুস্পষ্ট যে, মুসলিম জাতি ইতিহাসের সবচেয়ে করুণ সময় অতিক্রম করছে। গোলামির শিকলে আজ তারা আবদ্ধ। পৃথিবীর দিকে দিকে তাকালে দেখা যায় মুসলমানদের নিদারুণ অসহায়ত্বের মর্মন্তুদ দৃশ্য। আজ অত্যাচার ও নিপীড়নের খড়গ নেমে এসেছে তাদের ওপর। দেশে দেশে নির্যাতিত অসহায় মুসলমান নারী পুরুষদের আর্তচিৎকারে ভারী হয়ে উঠেছে পৃথিবীর আকাশ বাতাস। সাগরে ভেসে বেড়াচ্ছে মুসলমান শিশু ও বৃদ্ধের লাশ। সামগ্রিকভাবে মুসলিম উম্মাহ আজ ইতিহাসের সর্বাধিক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি।

এ নিদারুণ ক্রান্তি ও অচল অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে, লজ্জাস্কর এ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে হলে উম্মাহর তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলে সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন তরুণ ও যুব প্রজন্মের হাতেই পরিবর্তন ঘটবে অধুনা মুসলমানদের করুণ পরিস্থিতির। তাদের হাতেই রচিত হবে আগামীর বিজয়। তবে এর জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট কিছু কর্মপন্থা ও উত্তম কতিপয় করণীয়। যা সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। নিম্নে মুসলিম

তরুণ ও যুব প্রজন্মের করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হলো, যার মাধ্যমে উম্মাহর অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হবে।

তরুণ প্রজন্মকে ভ্রষ্টতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে

উম্মাহর অবস্থা পরিবর্তনে মুসলিম যুবকদের অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতার বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আল্লাহর নাফরমানি ও অবাধ্যতা থেকে ফিরে আসতে হবে সঠিক পথে। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার রজ্জুকে আঁকড়ে ধরতে হবে সুদৃঢ়ভাবে। মুসলিম তরুণ প্রজন্মের নিজেদের পরিবর্তনের সকল উপায় তাদের নিকটই রয়েছে। তারা যদি আন্তরিকভাবে চায় তবেই তারা সরল ও সঠিক পথে ফিরে আসবে।
আজ মুসলিম তরুণ প্রজন্মের অবস্থা খুবই মন্দ। তাদের চারিত্রিক অবনতি ঘটেছে অত্যন্ত করুণভাবে। তাদের চলনে-বলনে নেই ইসলামের ন্যূনতম নিদর্শন। বাহ্যিকভাবে তাদের সুখী দেখালেও ভেতরে তারা যাপন করছে অতি কষ্টের জীবন। তাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়, কেমন আছে? তাহলে জবাবে তারা বলে, সুখে ও আনন্দে আছে। কিন্তু বাস্তবে তারা সুখে নেই। তাদের পার্থিব জীবনকে ঘিরে রেখেছে কঠিন যন্ত্রণা।

আমি আমার নিজ অভিজ্ঞতা থেকে একটি ঘটনা বলছি। একবার আমি জরুরি প্রয়োজনে রিয়াদে যাচ্ছিলাম। বিমানে আমার এক পূর্ব-পরিচিত বন্ধুর সাথে দেখা। একসময় আমাদের মাঝে খুবই আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তারপর জীবন ও জীবিকার ব্যস্ততায় পরস্পরে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। দীর্ঘ দশ বছর আমাদের সাক্ষাৎ হয়নি। সেদিন বিমানে তার সাথে আমার আচমকা সাক্ষাৎ ঘটে। দীর্ঘ বিরতির পর আকস্মিক এ সাক্ষাতে আমরা উভয়ে যারপরনাই আনন্দিত হয়েছি। উষ্ণ আলিঙ্গনে আমরা জড়িয়ে ধরি একে অপরকে। বিমানে আমরা পাশাপাশি বসি। নিজেদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দীর্ঘ কথা হয়। প্রথম যখন তার সাথে দেখা হয়, আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, কেমন আছে? সে অভ্যাস অনুযায়ী জটপট উত্তর দিলো, খুবই ভালো আছে এবং পরিবার নিয়ে সুখে শান্তি আছে। ইতোমধ্যে বিয়েও করেছে। একটি ফুটফুটে পুত্রসন্তানও জন্ম নিয়েছে তাদের সংসারে। তার জীবনের সুখময় ঘটনাগুলো শোনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হচ্ছি। কিন্তু

এ সবকিছুই ছিল মিথ্যা। মিষ্টি কথার আড়ালে লুকিয়ে ছিল নীল যন্ত্রণা। সুন্দর হাসির পেছনে লুকিয়ে আছে দীঘল দুঃখের সাতকাহন। বাস্তবিক অর্থে সে সুখী ছিল না। তার জীবনে কোনো প্রশান্তি ও স্থিরতা ছিল না। তার পরিবার আছে, স্ত্রী সন্তান আছে কিন্তু সুখ নেই। কথায় কথায় যখন আমরা জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করছি তখন সে তার জীবনের প্রকৃত অবস্থা আর লুকিয়ে রাখেনি আমার নিকট। আর যেহেতু আমি তার বাল্যবন্ধু তাই অন্য সবার মতো আমাকে শেষ পর্যন্ত ধোঁকা দেয়নি।

সে বলতে লাগল তার জীবনের দীর্ঘ কাহিনি। আমি দেখি তার জীবন আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার নাফরমানি ও অবাধ্যতায় পূর্ণ। গোনাহ ও পাপাচারের কাহিনিতে ভরপুর। সে বলল, 'আমি আজ এক বছর আমার পরিবার থেকে দূরে। দীর্ঘ এ সময় আমার স্ত্রী সন্তানের সাথে কোনো প্রকার দেখাসাক্ষাৎ নেই। আমাদের সম্পর্কে টানাপোড়েন দেখা দেয়। ঝগড়া করে আমার স্ত্রী একদিন তার পিতৃগৃহে চলে যায়। আমার সংসার যেন একটি জাহান্নাম। যেখানে সর্বদা অশান্তির আগুন জ্বলছে। প্রকৃতার্থে এ সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার ওপর শাস্তি। আমি বহু অন্যায় ও পাপাচারে লিপ্ত হয়েছি। আমার ব্যক্তিগত জীবনে নেই ইসলামের অনুশাসন। আল্লাহর আদেশ-নিষেধের পরোয়া করি না। তার আনুগত্য করি না। এর মধ্যে একটি ঘটনা আমার জীবনে দারুন প্রভাব ফেলেছে। একবার আমি জরুরি ভ্রমণে দেশের বাহিরে যাই। এক সপ্তাহের একটি ব্যাবসায়িক ভ্রমণ ছিল।

ঘটনাক্রমে সেখানে একটি খারাপ মেয়ের সাথে আমার পরিচয় হয়। ক্রমান্বয়ে সে পরিচয় অধিক ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। শয়তান আমাকে প্ররোচনা দিতে থাকে। তাছাড়া আমার জীবনে তো ইসলামের বিধি-নিষেধের কোনো প্রভাব ছিল না। একরাতে আমি সে মেয়েটিকে নিয়ে হোটেলে ওঠি। অথচ আমি বিবাহিত। আমার সুন্দরী স্ত্রী আছে। তথাপিও আমি তার পেছনে লেলিয়ে পড়ি। আমি যখন আমার ও মেয়েটির শরীর থেকে সমস্ত কাপড় খুলে ফেলি তখন মসজিদের মিনার থেকে আজান ভেসে আসে। আমি তখন দেখি, আজান ও আল্লাহর নামের অপূর্ব ধ্বনি মেয়েটির মধ্যে এক আশ্চর্য পরিবর্তন সৃষ্টি করে। সে দ্রুত নিজেকে আমার বাধন থেকে মুক্ত করে নেয়। কাপড় পরিধান করে বাথরুমে চলে যায়। তারপর অতি উত্তমরূপে সে অজু করে। আজান শেষ হলে রুমে এসে নামাজে দাঁড়িয়ে যায়। এবং আল্লাহর নিকট তার কৃত পাপের জন্য কান্নাকাটি করতে থাকে। আমি আশ্চর্য হয়ে

তার অবস্থা প্রত্যক্ষ করছি। কিন্তু তার এমন বিস্ময়কর পরিবর্তন দেখেও আমার মাঝে কোনো প্রকার পরিবর্তন আসেনি। আমার মন পূর্বের মতোই কদর্যতায় ভরপুর ছিল। আমি মেয়েটির সাথে আর কোনো কথা না বলে হোটেল থেকে বের হয়ে চলে আসি। আর ভাবতে থাকি, আমার নোংরা জীবন সম্পর্কে। আল্লাহর অবাধ্যতা ও নাফরমানি করতে করতে আমি কোন পর্যায়ে চলে গেছি যে, আজানের ধ্বনি একজন বেশ্যা মেয়ের মাঝে পরিবর্তন এনেছে কিন্তু আমার হৃদয়ে কোনো প্রকার ভাবান্তর সৃষ্টি করেনি। আমি বুঝতে পারি, আমার দীর্ঘ জীবনের পাপ আমাকে নষ্ট ও ভ্রষ্টতার চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেছে। আমি আর কতকাল এ অবস্থায় অবিচল থাকব? আমি এর থেকে বের হয়ে আসতে চাই।'

তার জীবনের বৃত্তান্ত শুনে আমি খানিক স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। আমার মনোজগতে ভাসতে থাকে তার নিদারুণ যন্ত্রণায়ময় জীবনের ছবি। আমি কল্পনা করতে থাকি, অশান্তির অনলে পুড়তে থাকা আমার বন্ধুর যাপিত জীবন। তার বাহির ও ভেতরের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাহিরে তাকে দেখা যায় একজন সুখী ও প্রশান্তচিত্তের মানুষ। এবং লোকজন জিজ্ঞেস করলে সে এমনই বলে। কিন্তু প্রকৃতার্থে সে চরম অসুখী ও অশান্তির অনলে প্রজ্জ্বলিত। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, নামাজে দাঁড়ালে তোমার অবস্থা কেমন হয়? সে বলল, আমি নামাজ পড়ি না। আমি আশ্চর্য হয়ে তাকে বললাম, কেন তুমি নামাজ পড় না? আল্লাহর আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে তোমার কি কোনো জ্ঞান নেই? তুমি কি জানো না আল্লাহর পরিচয়? আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তার সকল বান্দাকে নামাজের আদেশ করেছেন। নামাজের মাধ্যমেই সম্ভব জীবনের পরিবর্তন। যার নামাজ যত সুন্দর তার জীবন ঠিক তত সুন্দর। সুতরাং নামাজ আদায়ে সচেষ্ট হও। নামাজে স্থির হও। সর্বদা নামাজ আদায় করো। মসজিদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করো। হৃদয়কে মসজিদের সাথে বেঁধে নাও শক্তভাবে। তবেই জীবনে পরিবর্তন আসবে। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ততক্ষণ পর্যন্ত কারো জীবন পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না সে নিজে তার জীবন পরিবর্তনের ইচ্ছে করে। আমার সাথে সামান্য সময়ের অবস্থানে তার মধ্যে অভাবনীয় পরিবর্তন সৃষ্টি হলো। তার চোখে-মুখে আমি পরিবর্তনের ঝিলিক প্রত্যক্ষ করছিলাম। আমার যুবক বন্ধুটি আমার সাথে থেকে যেতে চাইল এবং তার জীবন পরিবর্তন করার আগ্রহ পেশ করল। কিন্তু আমি একটি জরুরি কাজে যাচ্ছিলাম। তাই আমি তাকে সাময়িক বিদায় জানিয়ে পুনরায় সাক্ষাতের আশাবাদ ব্যক্ত করে বিমান থেকে অবতরণ করে

তার থেকে বিদায় নিলাম। কদিন পর পুনরায় তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। সে আমাকে দেখে দ্রুত এগিয়ে এলো। তার বর্তমান অবস্থার কথা জানাল। সে বলল, আমি নামাজ পড়ছি। আমি যখন প্রথম নামাজ পড়ি তখন হৃদয়ে অন্যরকম এক প্রশান্তি অনুভব করি। আমার তখন অনুভব হয় যে, আমি আল্লাহর অতি নিকটে দাঁড়িয়ে আছি। আল্লাহ ও আমার মাঝে দ্বিতীয় কোনো প্রতিবন্ধকতা আমি অনুভব করিনি। এভাবেই তার জীবন পরিবর্তনের সূচনা হলো। নামাজের মাধ্যমে সে আল্লাহর পরিচয় লাভ করতে থাকে। এবং নিজের অতীত পাপেভরা জীবন পরিত্যাগ করে সত্য ও সুন্দরের পথে ফিরে আসে।

মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস ও ক্ষতির মাঝে ডুবে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না হৃদয়ে আল্লাহর পরিচয় লাভ করবে। আল্লাহর বড়ত্ব ও মাহাত্ম্যের মারেফত অর্জন করা ব্যতীত মানুষ তার জীবনের পরিবর্তন সাধিত করতে পারবে না। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

'আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদত করার জন্য।' [৬]

এ আয়াতের একটি ব্যাখ্যা হলো, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি তোমরা আমার পরিচয় জানার জন্য। সুতরাং যদি তুমি নামাজ আদায় না করো, আল্লাহর সামনে নিজেকে নত না করো তাহলে কীভাবে আল্লাহর পরিচয় লাভ করবে? যদি আল্লাহর আদেশসমূহ পালন না করো, নিষেধসমূহ থেকে বিরত না থাকো তাহলে কীভাবে তুমি তোমার রবের পরিচয় অর্জন করবে? তুমি আল্লাহর বান্দা। তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমার প্রয়োজনীয় সকল জিনিস তিনি তোমাকে দান করেছেন। তাই অত্যাবশ্যক হলো, আল্লাহর পরিচয় হৃদয়ে ধারণ করা। আল্লাহর আনুগত্যশীল বান্দা হয়ে জীবনযাপন করা। নচেৎ জীবনে নেমে আসবে অসহনীয় দুর্যোগ। অশান্তি ও অস্থিরতা ঘিরে ধরবে জীবনকে। তুমি যদি অন্যায় ও পাপকর্ম থেকে ফিরে না আসো তাহলে তোমার স্ত্রী তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে। তোমার পরিবার-পরিজন তোমাকে পরিত্যাগ করবে। পৃথিবীর সকল মানুষ তোমাকে অবজ্ঞা

---

৬ সূরা যারিয়াত: ৫৬

করবে। এর কারণ তোমার পাপ ও আল্লাহর অবাধ্যতা। স্রষ্টার অবাধ্যতা ও নাফরমানি তোমার জীবনে ডেকে নিয়ে আসবে সমূহ অশান্তি। প্রবল ঐশ্বর্যের ভেতর থেকেও তুমি খুঁজে পাবে না শান্তির দেখা। আর যদি আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার পরিচয় লাভ করতে পারো, হৃদয়ে ধারণ করতে পারো মহান সে রবের সন্তুষ্টি, তাহলে বিত্ত-বৈভবহীন জীবনেও দেখা পাবে সুখের অঢেল প্রাচুর্য। মূলত আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তার নির্দেশিত জীবন পরিচালনাই জীবনে আনতে পারে সুখ।

আজ মুসলিম তরুণদের হৃদয়ে আল্লাহর পরিচয় নেই। তারা জানে না আল্লাহর আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে। সর্বদা তারা বহু অন্যায় ও পাপকর্মে নিমজ্জিত। তারা চলছে, ফিরছে ও হাসছে। কিন্তু প্রকৃতার্থে তাদের জীবন বিষাদে ভরপুর। তাদের সে জীবনে নেই শান্তি ও সুখের পরশ। বাহ্যিকভাবে তাদের হাসতে দেখা গেলেও তাদের হৃদয় যন্ত্রণার অশ্রুতে ভরপুর। তাদের জীবনের খাঁচা থেকে সুখপাখি উড়ে গেছে। আর এসব কিছুই তাদের পাপ ও গোনাহের ফসল। সুতরাং তুমি তোমার পাপী ও গোনাহগার বন্ধুদের বলো, তারা যেন ফিরে আসে। পরিত্যাগ করে আল্লাহর অবাধ্যতা ও নাফরমানি। প্রকৃত শান্তি ও সুখের জীবনে তাদের ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা ও শ্রম অব্যাহত রাখো।

নামাজের প্রতি যুবকদের যত্নবান হতে হবে

একবার আমি রাতের শেষ প্রহরে গাড়িতে চড়ে দূরে কোথাও যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে তিনজন যুবককে দেখতে পেলাম তারা রাতের অন্ধকারে হাঁটছে। তাদের দেখে আমি গাড়ি থামালাম। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তারা কোথায় যাবে? দাম্মামে যাবে, একজন উত্তর দিলো। বললাম, আমিও সেদিকেই যাব, চাইলে তোমরা আমার সাথে গাড়িতে উঠতে পারো। আমি তোমাদের গন্তব্যস্থলে নামিয়ে দেব। তারা গাড়িতে উঠল। বয়সে তারা ছিল সদ্য তরুণ। সকলের বয়স একুশ-বাইশ হবে। চলতে চলতে আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা দাম্মামে কেনো যাচ্ছ? তারা বলল, চাকরির জন্য। চাকরির জন্য তারা এতদূর পথ পাড়ি দিচ্ছে। এ নিন্দনীয় কিছু নয়। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা সকলকে রিজিক অনুসন্ধান করতে আদেশ করেছেন। তাই চাকরির অনুসন্ধানে বহুদূর পাড়ি দেওয়া দোষের কিছু নয়। কিন্তু দোষের বিষয় হলো, রিজিকের জন্য এত দূর পাড়ি দিচ্ছে, সীমাহীন কষ্ট সহ্য করছে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার হক পালনের ব্যাপারে তাদের মাঝে কোনো প্রকার আগ্রহ উদ্দীপনা নেই। রিজিকের তালাশে পাড়ি দিচ্ছে এক শহর থেকে আরেক শহর, কিন্তু আল্লাহর অপরিহার্য বিধান নামাজ পালনের জন্য তারা মসজিদে পর্যন্ত যায় না। রিজিক তালাশ করা দোষের কিছু নয়।

কিন্তু দোষের বিষয় হলো, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনে অমনোযোগী হওয়া। আমি তাদের বললাম, তোমরা আমাকে সত্য করে বলো তোমাদের সার্টিফিকেট এবং তোমাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কেমন? একজন মধ্যম স্তরের, বাকি দুজন এরও নিচে। এবার আমি তাদের বললাম, এ সমগ্র পৃথিবীর একমাত্র মালিক মহান আল্লাহ তায়ালা। পৃথিবীল পূর্বাপর সবকিছু একমাত্র তার। রিজিক ও সফলতার চাবিকাঠি একমাত্র তার হাতে। তিনি যদি কাউকে সফলতা দান করেন তাহলে কেউ তাকে ফেরাতে পারবে না। আর তিনি যদি কাউকে ব্যর্থ করেন তাহলে কেউ তাকে সফল করতে পারবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন। আল্লাহর সাথে যে আছে, আল্লাহর তার সাথে আছেন। আল্লাহ ও বান্দার সম্পর্ক হলো পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও দামি সম্পর্ক। মানুষের সফলতা ও ব্যর্থতা লুকিয়ে আছে এ সম্পর্কের গভীরে। জেনে রেখো! নামাজ হলো এমন ইবাদত যা আল্লাহ ও বান্দার মাঝে সম্পর্ক স্থাপন

করে। নামাজে দাঁড়িয়ে আল্লাহর সাথে বান্দা বিশেষ কথোপকথন করে। বান্দা আল্লাহর নিকট তার সাহায্যের কথা ব্যক্ত করে। আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দেন। সুতরাং আল্লাহ ও বান্দার সম্পর্কের সূচনা হয় নামাজের মাধ্যমে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

> 'তোমার পরিবার-পরিজনকে নামাজের আদেশ করো এবং নিজে তাতে অবিচল থাকো। আমি তোমার কাছে কোনো জীবিকা চাচ্ছি না। আমিই তোমাকে জীবিকা দিয়ে থাকি। আর শুভ পরিণাম তো তাদের জন্য যারা আল্লাহকে ভয় করে।'[৭]

নামাজ হলো ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। নামাজের মাধ্যমে নির্ধারণ হয় আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার সাথে কার কেমন সম্পর্ক। তাই আমি তাদের প্রথমে নামাজের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। আমার পাশে যে বসেছে তাকে সর্বাগ্রে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি নামাজ পড়? সে বলল, হে শাইখ! আমি কি সত্য বলব নাকি মিথ্যা বলব? আমি বললাম, তুমি যদি মিথ্যা বলো তাহলে মিথ্যার পরিণাম তোমার ওপরই পতিত হবে আর যদি সত্য বলো তাহলে যাবতীয় কল্যাণ তোমার জন্য। আমার কথা শুনে যুবকটি বলল, হে শাইখ! আমি সত্যই বলছি, আমি নামাজ পড়ি না। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি কাফের? সে বলল, না। আমি বললাম, তাহলে নামাজ পড় না কেন? অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে ইরশাদ করেছেন,

---

৭ সুরা তহা: ১৩২

العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر

بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة

'আমাদের মাঝে এবং তাদের মাঝে অঙ্গীকার হলো নামাজ। সুতরাং যে নামাজ ছেড়ে দিলো সে কাফের হয়ে গেল। মুসলমান ও কাফেরের মাঝে ব্যবধান হলো নামাজ ছেড়ে দেওয়া।'[৮]

জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি চাও তোমাকে কাফের নামে সম্বোধন করা হোক? সে বলল, না। আমি বললাম, তাহলে নামাজ আদায়ের প্রতি যত্নবান হও। ঈমানের পর নামাজই হলো ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আমল।

দ্বিতীয় যুবকটি বলল, আমি তার চেয়ে ভালো আছি।
আমি বললাম কীভাবে?
সে বলল, দৈনিক দুই ওয়াক্ত নামাজ পড়ি। আমি বললাম, এ তো ভারি আশ্চর্যের কথা। তুমি কি নতুন কোনো শরিয়ত প্রবর্তন করেছ? আল্লাহ তায়ালা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আদেশ করেছেন। আর তুমি কিনা দিনে পড় মাত্র দুই ওয়াক্ত। হে আল্লাহর বান্দা! এ কেমন উদাসীনতা? ইসলামের ভিত্তি রাখা হয়েছে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ওপর। সে জিজ্ঞেস করল, আমার করণীয় কী? আমি বললাম, এখন থেকে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে।
তৃতীয় জনের ব্যাপার তো আরো ভারি আশ্চর্যের! সে বলল, আমি সাপ্তাহিক জুমার নামাজ পড়ি। প্রতি জুমায় একবার মসজিদে যাই।
এ হলো আজকের মুসলিম তরুণ প্রজন্মের অবস্থা। তারা সপ্তাহে একদিন মসজিদে যায়। আল্লাহ তায়ালার দেওয়া শরিয়তের পরিবর্তে তারা যেন মনগড়া নতুন শরিয়ত প্রবর্তন করেছে। তারা কেবল বিপদে পতিত হলেই আল্লাহকে স্মরণ করে। বিপদে পতিত হলে দৌড়ে মসজিদে যায়। আল্লাহকে

---

৮ এ হাদিসের মাধ্যমে নামাজের গুরুত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। ঈমানের পর সর্বোত্তম ইবাদত হলো নামাজ। নামাজ পরিত্যাগকারীর ভয়াবহ পরিণাম ও ইসলামের ব্যাপারে তার ঈমানের দুর্বলতা বর্ণনা করতেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। যে মুসলমান নামাজ পড়বে না তার ঈমান পরিপূর্ণ নয়। এর দ্বারা সে কাফের হবে না। হ্যাঁ, কেউ যদি নামাজকে অস্বীকার করে তাহলে কাফের হয়ে যাবে।

ডাকে। আর যখন বিপদ কেটে যায় অমনি তারা ভুলে যায় আল্লাহকে। ভুলে যায় মসজিদ।

মৃত ব্যক্তিদের গোসল দেন এমন এক ব্যক্তি একটি করুণ কাহিনি শুনিয়েছেন। তিনি বলেন। এক যুবক। সুদর্শন। শারীরিক সক্ষমতায় ছিল পূর্ণ। হঠাৎ মৃত্যুবরণ করে। তাকে গোসল দেওয়ার জন্য আমাকে ডাকা হলো। আমি যখন গোসল দেওয়ার জন্য তার মুখমণ্ডল খুলেছি, দেখি—তার সুন্দর চেহারা অত্যন্ত কুৎসিত ও ভয়ংকর আকৃতি ধারণ করে। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা সত্যই বলেছেন,

وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ

'ফেরেশতারা যখন কাফেরদের জান কবজ করে তখন তুমি যদি দেখতে, তারা তাদের মুখে ও পাছায় আঘাত করে আর বলে, জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করো। এটি তোমাদের কৃতকর্মের ফল। আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না।'[৯]

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ .

'আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুম করেননি, বরং তারা নিজেরা নিজেদের ওপর জুলুম করেছে।'[১০]

লোকটি বলেন, এ দেখে আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যাই। ভয়ে আমি গোসলখানা থেকে দ্রুত বের হয়ে আসি। বাহিরে যুবকের পিতা দাঁড়নো ছিল। আমি তার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম যুবকের ঈমান-আমল সম্পর্কে? কেন এমন পরিণতি হলো তার? তিনি আমাকে বললেন, সে নামাজ পড়ত না। আমল সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ গাফেল ও উদাসীন।

---

৯ সুরা আনফাল: ৫০-৫১

১০ সুরা আলে ইমরান: ১১৭

হে আল্লাহর বান্দাগণ! যুবকটি ছিল গাফেল। আমলের প্রতি ছিল তার চরম উদাসীনতা। তাই সে নামাজ পড়ত না। আর তাই তার পরিণতি কেমন নিদারুণ হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

'আল্লাহর স্মরণ ও তার অবতীর্ণ সত্যের কল্যাণে মুমিনদের জন্য কি সময় হয়নি যে, তাদের অন্তর বিনম্র হবে এবং তারা তাদের মতো হবে না যাদের ইতিপূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল? অতঃপর বহুকাল অতিক্রান্ত হওয়ায় তাদের অন্তর শক্ত হয়ে গিয়েছে। তাদের অনেকেই অবাধ্য। জেনে রেখো! আল্লাহ জমিনকে মৃত্যুর পর জীবিত করেন। আমি তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো।'[১১]

আমি সে তিন যুবককে বললাম, তোমরা কি জানো? আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে কতবার নামাজের কথা বলেছেন? নব্বই এবং তারও অধিকবার নামাজের কথা বলেছেন। নিশ্চয়ই তোমরা অনুধাবন করতে পারছ নামাজের গুরুত্ব কত সীমাহীন। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম বান্দার যে আমলের হিসাব চাইবেন তা হলো নামাজ। নামাজের হিসাবে যে ঠিক ঠিক উত্তীর্ণ হতে পারবে তার অন্যান্য হিসাব সহজ হয়ে যাবে। তাই নামাজের প্রতি উদাসীন হয়ো না। গুরুত্বের সাথে মসজিদে জামাতের সাথে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করো। তাহলে আল্লাহ তোমাদের রিজিকের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকে তিনি তোমাদের রিজিকের ব্যবস্থা করবেন। জীবিকার ব্যাপারে তোমাদের পেরেশানি দূর হয়ে যাবে।

---

১১ সুরা হাদিদ: ১৬-১৭

এক যুবক আমাকে একটি হৃদয়স্পর্শী ঘটনা শুনিয়েছে। যুবকটি বলল, আমার এক বন্ধু ছিল। আমি ও সে কখনো নামাজ পড়তাম না। নামাজের সময় আমরা খেল-তামাশায় মত্ত থাকতাম। বরং যারা নামাজ পড়ত আমরা তাদের নিয়ে বিদ্রূপ করতাম। একদিন রাতভর আমরা খেল-তামাশায় মত্ত থেকে সকালে যার যার বাড়ি এসে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। কিছুক্ষণ পর আমার বড় ভাই আমাকে তাড়াহুড়ো করে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলল। এবং বলল, আমার বন্ধুটি মারা গেছে। প্রথমে আমি তার কথা বিশ্বাস করিনি। ভেবেছি দুষ্টমি করছে হয়তো। কেননা, কিছুক্ষণ পূর্বেই আমি ও সে একসঙ্গে ছিলাম। কিন্তু আমার ভাই অত্যন্ত জোরগলায় বলতে লাগল। আমি আমার বন্ধুর বাড়ির দিকে রওনা হই। পথে তার পিতার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। তিনি কাঁদতে কাঁদতে আমাকে তার মৃত্যুর সংবাদ দিলেন। ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি অব্যাহত ঘৃণাচর্চার কারণে আমার সে বন্ধুকে গোসল দেওয়া হয়নি। মুসলমানদের কবরে তাকে দাফন করা হয়নি। সে নামাজ পড়ত না। বরং যারা নামাজ পড়ত তাদেরকে ঠাট্টাবিদ্রুপ করত। তার কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাকে গোসল ও মুসলমানদের কবরে দাফন করা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তারপর তিনি বললেন, আমি কতবার তোমাদের দুজনকে পাপ ও অন্যায় কাজ ছেড়ে দিতে বলেছি। নামাজ পড়তে বলেছি। কিন্তু তোমরা কখনো আমার কথায় কর্ণপাত করোনি।

এ ঘটনা আমার জীবনকে দারুণ প্রভাবিত করেছে। আমি সেদিন উপলব্ধি করতে পারি, আমি আসলে জঘন্য অন্যায় ও ভুলের ওপর আছি। একদিন আমাকেও তার মতো মৃত্যুবরণ করতে হবে। প্রতিটি মানুষকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। চাই সে আকাশে থাকুক কিবা জমিনে। যেখানেই থাকুক মৃত্যু তাকে গ্রাস করবেই। এ অবশ্যম্ভাবী। সেদিনই আমার পিতা আমাকে সতর্ক করে বললেন, তুমি যদি নামাজ না-পড় তাহলে লোকেরা তোমাকেও মুসলমানদের কবরে দাফন করতে দেবে না। তাই তুমি ফিরে এসো সঠিক পথে। তিনি আমাকে নিয়মিত নামাজ আদায় করতে বললেন। মানুষের সাথে সদাচরণ করতে বললেন। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার প্রতি গুরুত্বারোপ করলেন। পার্থিব জীবনের অসারতার কথা তুলে ধরলেন আমার সামনে। তুলে ধরলেন মৃত্যু-পরবর্তী অসীম জীবনের কথা। যেখানে রয়েছে কঠিন কঠিন ঘাটি। রয়েছে বিভীষিকাময় জাহান্নাম। যা প্রস্তুত করা হয়েছে গোনাহগারদের জন্য। তাদের জন্য যারা নামাজ পড়ে না। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে না। পিতার কথা আমার হৃদয়ে গভীর

রেখাপাত করল। আর যেহেতু আজ সকালেই আমার প্রিয় বন্ধু আকস্মিক মৃত্যুবরণ করেছে এবং তার সাথে ঘটে গেছে হৃদয়বিদারক ঘটনা তাই আমার হৃদয় ছিল অত্যধিক আর্দ্র ও আবেগতাড়িত। এরপর আমার জীবনে পরিবর্তন আসে। আমি নিজেকে পরিবর্তনের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হই। আমি অনুভব করি, হায়াতের অফুরন্ত সময় পেরিয়ে গেছে। কিন্তু পরকালের জন্য সঞ্চয় করতে পারিনি কিছুই। আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি ছিলাম উদাসীন। সেদিন থেকেই আমি মসজিদে যেতে শুরু করি। অবশিষ্ট জীবন সরল ও সঠিক পথে চলার শপথ গ্রহণ করি।'

আল্লাহর শপথ! মুসলিম যুবকরা আজ বিচ্যুতি ও ভ্রষ্টতার চূড়ান্ত সীমা অতিক্রম করেছে। তাদের মাঝে নেই ইসলামি বিধি-নিষেধের ন্যূনতম দায়িত্ববোধ। প্রবৃত্তির অনুসরণ তাদের ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। বস্তুবাদ ও দুনিয়ার নেশায় আজ তারা অন্ধ। প্রতিটি পাড়া-মহল্লার মসজিদে মুসলিম যুবকদের উপস্থিতি সবচেয়ে কম। অথচ উম্মাহর ভাগ্য পরিবর্তনের নেতৃত্ব ছিল তাদেরই হাতে। উম্মাহর দুর্দশা ও অবনতির পেছনে প্রধানত দায়ী মুসলিম যুব ও তরুণ প্রজন্ম ইসলামের সরল-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া। তারা যদি মনে-প্রাণে কামনা করে মুসলিম জাতি তার পুরনো গৌরব অর্জন করুক তাহলে সর্বপ্রথম তাদের নিজেদের পরিবর্তন করতে হবে। তারা যদি ধ্বংসের গর্ত থেকে উঠে আসে তবেই মুসলিম জাতি উঠে আসবে পতনের অতল গহ্বর থেকে।

মৃত ব্যক্তিদের গোসল দেন এমন ব্যক্তি একটি অতি আশ্চর্যজনক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এক যুবককে গোসল দেওয়ার জন্য আমি ভেতরে প্রবেশ করি। আমার সাথে ছিল আরো একজন। আমরা যখন মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিচ্ছি তখন পুরো গোসলখানায় এক আশ্চর্য সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ে। অপূর্ব সুঘ্রাণে চারপাশ সুরভিত ও মোহিত হয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আমার সহকারীকে বললাম, তুমি কি সুঘ্রাণ পাচ্ছ? সে বলল, হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, ইতিপূর্বে আমি কখনো এমন সুঘ্রাণ পাইনি। এবং তার মুখমণ্ডল অতি উজ্জ্বলতায় ফকফক করছিল। আমি অসংখ্য ব্যক্তিকে গোসল দিয়েছি কিন্তু এমন সুন্দর চেহারা কোনো মৃত ব্যক্তির দেখিনি। আমি অত্যন্ত আগ্রহ উদ্দীপনার সাথে যুবককে গোসল দিলাম। পরবর্তীতে আমি জানতে পারি, যুবকটি ছিল অত্যন্ত সৎ ও পরহেজগার। তাকওয়া ও খোদাভীতিতে তার অন্তর ছিল পরিপূর্ণ। সৎকাজের আদেশ করত, অসৎকাজ থেকে

লোকদের বিরত রাখত। তার জীবন ছিল সততা ও উত্তম আদর্শে মোড়ানো। আমরা তাকে গোসল, কাফন ও জানাজা শেষে কবরস্থানে নিয়ে গেলাম। আমি নিজেই যুবককে কবরস্থ করি। আল্লাহর কসম! আমি দেখি, কবরে রাখার পর তার লাশ কেমন নড়ে উঠল। অথচ কেউ তাকে স্পর্শ করেনি। আমি আশ্চর্য হয়ে আমার সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলাম। তারাও এমনটি অনুভব করল। তার চেহারা আপনা থেকেই কেবলামুখি হয়ে গেল। আমি আশ্চর্য হয়ে যুবকের মুখমণ্ডলের দিকে তাকালাম। দেখি সে হাসছে। অতি উজ্জ্বল তার চেহারার রঙ। যেন আকাশ থেকে পূর্ণিমার চাঁদ নেমে এসেছে কবরে। আমি ধারণা করলাম, সত্যিই সে মৃত্যুবরণ করেছে কি না। কিন্তু পরক্ষণেই আমার সন্দেহ দূর হয়ে গেল। কারণ, আমিই তো তাকে গোসল দিয়েছি আর আমি জানি সে ছিল একজন আদর্শবান যুবক। মসজিদের সাথে ছিল তার সুদৃঢ় সম্পর্ক। আনুগত্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল তার জীবন। কখনো আল্লাহর অবাধ্যতা করেনি। আমরা যুবককে কবরস্থ করে ফিরে এলাম।'

এ তো আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার ঘোষিত বাণীর বাস্তব রূপ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

'যারা বলে আমাদের প্রভু আল্লাহ অতঃপর সত্যের ওপর অবিচল থাকে (মৃত্যুর সময়) তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না ও চিন্তিত হয়ো না। আর তোমাদের যে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হতো তা শুনে নাও।' [১২]

---

১২ সুরা হা মিম সিজদাহ: ৩০

জীবনের প্রকৃত মাকসাদ

মুসলিম যুব ও তরুণ প্রজন্মের গন্তব্য কোথায়? কী তাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য? আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দিয়ে মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, কাঙ্ক্ষিত সে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য রয়েছে কতিপয় নীতিমালা। আল্লাহ তায়ালা তার কোনো বান্দাকে ভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করেন না । কোনো বান্দার ওপর তিনি জুলুম করেন না। তিনি মানুষদের সামনে উন্মোচন করে দিয়েছেন এক সরল-সঠিক পথ। যে পথের ডানে-বায়ে নেই কোনো বক্রতা। আল্লাহ তায়ালা মানুষের ওপর অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের জন্য তৈরি করেছেন এক সরল-সঠিক পথ। মানুষের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য হলো, সে পথে চলা। কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত বিচ্যুত হবে না যতক্ষণ সে আল্লাহর দেওয়া সরল-সঠিক পথের ওপর অটল ও অবিচল থাকবে। কিন্তু যখনই আল্লাহ তায়ালার মনোনিত সরল-সঠিক পথ ছেড়ে শয়তানের তৈরি অবাধ্যতা, নাফরমানি ও বক্রতার পথ অবলম্বন করবে তখনই সে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য থেকে ছিটকে পড়বে। তাই প্রত্যেককে ইসলামের সরল-সঠিক পথে অটল ও সুদৃঢ় থাকার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট বিশেষ প্রার্থনা করতে হবে। কেননা, শয়তান চারদিকে ভ্রষ্টতা ও বক্রতার অসংখ্য পথ তৈরি করে রেখেছে। যে-কোনো মূল্যে শয়তান মানুষকে সিরাতে মুস্তাকিম থেকে বিচ্যুত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

আমি এক যুবককে চিনি। তার যাবতীয় বিষয়াদি সম্পর্কে আমি অবগত। শৈশব থেকেই ছিল সে অত্যন্ত ভদ্র ও নম্র প্রকৃতির মানুষ। ছিল আমলের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী। মসজিদের সাথে ছিল তার গভীর সম্পর্ক। আমার বিশ্বাস আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাকে আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন। শৈশব কৈশোর পেরিয়ে পরিণত বয়সে পৌঁছার পর মসজিদের সাথে সম্পর্ক আরো দ্বিগুণ হলো। পড়ালেখা সমাপ্ত করে সে চাকরি গ্রহণের বয়সে উপনীত হলো। তার চাকরি গ্রহণের একটি মনোমুগ্ধকর ঘটনা রয়েছে। সে সৈনিক পদে চাকরি গ্রহণের ইচ্ছা করল। যখন সে চাকরির জন্য দরখাস্ত দিতে গেল তাকে ছবি তুলতে বলা হলো। তখন তার মুখমণ্ডলে ছিল সুন্নতি দাড়ি। আর দাড়িতে তাকে খুবই সুন্দর দেখাত। তার চেহারার সৌন্দর্যকে দ্বিগুণ করে দিয়েছে দাড়ি। তখন চাকরিদাতা তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি

যদি দাড়ি মুখে ছবি তুলতে চাও তাহলে চাকরির শেষ পর্যন্ত তোমাকে দাড়ি রাখতে হবে। কখনো কাটতে পারবে না। কেননা, এখানে এটাই সিস্টেম। তাই তুমি ভেবেচিন্তে দেখো, দাড়ি কাটবে না রাখবে?' এ কথা শোনে যুবকটি বলল, মৃত্যু পর্যন্ত আমি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের মাঝে কোনো প্রকার পরিবর্তন করব না। তারপর দাড়ি রেখেই সে ছবি তুলল এবং সৈনিকের চাকরি গ্রহণ করল। ইসলামের সকল অনুশাসন মেনেই সে চাকরি করতে লাগল। তার মাঝে ছিল দাওয়াতের স্পৃহা। দিন-রাত সে যুবকদের সৎপথের দাওয়াত দিতে লাগল। যে কেউ তার নিকট কোনো কাজ নিয়ে এলে কোনো প্রকার বিরক্তি ও টালবাহানা ছাড়াই সে তাদের কাজ করে দিত। মানুষের উপকারের প্রতি সে ছিল আন্তরিক। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, এক ব্যক্তি লোকদের সাথে মিশে এবং তাদের প্রয়োজন পূরণ করে, তাদের কষ্টকে লাঘব করে এবং এক ব্যক্তি লোকদের সাথে মিশে না, তাদের কষ্টকে লাঘব করে না, তাদের মধ্যে কে উত্তম? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে লোকদের সাথে মিশে এবং তাদের কষ্টকে লাঘব করে।

যুবকটি পণ করেছিল, মৃত্যু পর্যন্ত সে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের মাঝে কোনো প্রকার পরিবর্তন করবে না। আমৃত্যু সে তার মুখে দাড়ি রাখবে। আল্লাহু আকবার! প্রকৃত ঘটনা তাই ছিল, যা সে বলেছিল। একদিন সে অনেক অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার পেটে দেখা দিলো কঠিন পীড়া। যা ছিল অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। সুস্থতার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হলো। কিছুদিন চিকিৎসা গ্রহণ করার পর মারা যায়। সে যখন মারা যায় তখন তার মুখে জ্বলজ্বল করছিল সুন্নতি দাড়ি, তার চোখে-মুখে যেন নুর চমকাচ্ছে। হাসপাতালের ডাক্তারগণ বলেন, আমরা যখন তাকে চিকিৎসা দিচ্ছিলাম তখন বারবার সে আল্লাহর নিকট এ প্রার্থনা করছিল, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে দ্বীনের ওপর অটল ও অবিচল রাখো। সিরাতে মুস্তাকিমের ওপর সুদৃঢ় রাখো। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের ওপর স্থির রাখো।'

এ ঘটনা ওইসব যুবকদের জন্য শিক্ষা যারা বলে নিজেকে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এ ঘটনা ওইসব যুবকদের জন্য শিক্ষা যারা বলে ইসলামের অনুশাসন মেনে চাকরি করা কঠিন। এ ঘটনা ওইসব যুবকদের জন্য শিক্ষা

যারা বলে মুখে দাড়ি রেখে মর্যাদাকর পদে আসীন হওয়া যায় না। এ ঘটনা ওইসব যুবকদের জন্য শিক্ষা যারা বলে ধর্ম পালন করে দুনিয়া উপার্জন করা অত্যন্ত কঠিন। আমি বলি, মুসলিম যুবকদের জন্য কিছুই অসম্ভব ও কঠিন নয়, যদি তারা নিজেদের পরিবর্তনে আগ্রহী হয়। প্রথমে নিজেকে পরিবর্তনের সদিচ্ছা গ্রহণ করতে হবে। ইসলামের অনুশাসন পালনে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হতে হবে। আল্লাহ তায়ালা ততক্ষণ পর্যন্ত কারো অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না সে নিজেকে পরিবর্তনের ইচ্ছে করে। সুতরাং হে মুসলিম যুব ও তরুণ প্রজন্ম! ফিরে এসো আল্লাহর নির্দেশিত পথে। ফিরে এসো সিরাতের মুস্তাকিমের ওপর। নিজেদের পরিবর্তনের অঙ্গীকার করো। নিজেদের যাপিত জীবন ও চরিত্রের সংশোধন করো। দুনিয়াকে আখেরাতের ওপর প্রাধান্য দিয়ো না। দুনিয়াতে ততটুকুই গ্রহণ করো যতটুকু তোমার প্রয়োজন। আর পরকালের জন্য ততটুকু গ্রহণ করো যতদিন তুমি সেখানে থাকবে। আর এ কথা তো সর্বাধিক সত্য যে, পরকাল এমন এক জীবন যার কোনো সমাপ্তি নেই। যার শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। সুতরাং অনন্তকালের জন্য যথোপযুক্ত পাথেয় গ্রহণ করো। মনে রেখো, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী আর আখেরাত চিরস্থায়ী।

প্রয়োজন আত্মজিজ্ঞাসা

মুসলিম যুব ও তরুণ প্রজন্মের আজ প্রয়োজন আত্মজিজ্ঞাসা। বারবার নিজেকে জিজ্ঞেস করা নিজের ঈমান সম্পর্কে, সালাত সম্পর্কে। বারবার নিজেকে বিবেকের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। নিজেই নিজের কাছে জানতে চাইবে ঈমান-আমল সম্পর্কে। আত্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমে হৃদয়ে গভীর অনুশোচনা জাগ্রত হয়। যার ফলে আল্লাহর অবাধ্যতা ও গোনাহ থেকে ফিরে আসা অত্যন্ত সহজ হয়।

হে যুবক! আমি তোমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করছি। তুমি সেসব প্রশ্নের সত্য ও ঠিক ঠিক জবাব দাও। তুমি যদি সত্য বলো তাহলে জেনে রাখো, সত্য তোমাকে মুক্তি দেবে। আর যদি মিথ্যা বলো তাহলে মিথ্যা তোমার ওপরই ডেকে আনবে ঘোরতর শাস্তি। সুতরাং আমার করা প্রশ্নসমূহের ঠিক ঠিক জবাব দাও। তুমি কি নামাজ পড়? তুমি কি নিয়মিত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়? নামাজের মাঝে তোমার অন্তরের অবস্থা কেমন হয়? তুমি কি আজ ফজরের নামাজ মসজিদে জামাতের সাথে পড়েছ নাকি একাকী? নাকি তুমি সেসব হতভাগা লোকদের অন্তর্ভুক্ত যারা আল্লাহকে রুকু করে না, সিজদা করে না? হে যুবক! তোমার বয়স কত? বিশ? ত্রিশ? নাকি চল্লিশ? আমি তোমাকে তোমার বিগত বিশ, ত্রিশ কিংবা চল্লিশ বছরের নামাজের হিসাব জিজ্ঞেস করছি না। আমি জানতে চাচ্ছি, তোমার চলতি বছরের বিগত মাসগুলোর কথা। এ দিনগুলোতে তুমি কত ওয়াক্ত নামাজ পড়েছ? কত ওয়াক্ত নামাজ ছেড়েছ? আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, তুমি সত্য বলো কত ওয়াক্ত নামাজ তুমি মুসলমানদের সাথে মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করেছ? হে যুবক! তুমি বলো, মসজিদের মিনার থেকে কতবার তোমাকে নামাজের জন্য আহ্বান করা হয়েছে এবং তুমি কতবার সে ডাকে সাড়া দিয়েছ? হে যুবক! মসজিদের মিনার থেকে কতবার ভেসে এসেছে এ কথা, ঘুমের চেয়ে নামাজ ভালো? তুমি কি আজান শুনে ঘুম থেকে উঠে মসজিদের দিকে ছুটে গিয়েছ নাকি আলস্যের চাদরে মুড়িয়ে ছিলে? হে যুবক! তুমি বলো তুমি কি সত্যিই নামাজের প্রতি যত্নবান?

হে মুসলিম যুবক! এসব প্রশ্ন তুমি নিজেকে করো। জানতে চাও এসব প্রশ্নের উত্তর। অতঃপর শোনো, তোমার হৃদয়ের আর্তনাদ। দেখো, তোমার অবস্থা

কোথায়? তুমি কি সরল সঠিক পথে আছ নাকি শয়তান এবং তোমার কুপ্রবৃত্তি তোমাকে বিচ্যুত করে ফেলেছে সিরাতে মুসতাকিম থেকে? হে যুবক! নামাজের ব্যাপারে সর্বাধিক যত্নবান হও। নামাজের প্রতি আন্তরিক হও। মসজিদের মিনার থেকে যখন আল্লাহর নামের আহ্বান ভেসে আসে তখন সে আহ্বানে সাড়া দাও। ধ্বংস ও পতনের গর্ত থেকে বের হয়ে আসার জন্য সর্বপ্রথম করণীয় হলো নামাজের প্রতি যত্নবান হওয়া। নামাজ মুমিনের জান্নাত ও জাহান্নামের পথ তৈরি করবে। আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্ট ভাষায় পবিত্র কুরআনে জান্নাত ও জাহান্নামে গমনের ভেদ উন্মোচন করে দিয়েছেন।

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ

'কোন কাজ তোমাদের জাহান্নামে নিয়ে এলো? তখন তারা বলবে, আমরা নামাজ পড়তাম না।' [১৩]

সুতরাং প্রত্যেক যুবকের অপরিহার্য কর্তব্য হলো, নিজেকে নামাজের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা। বিবেকের আদালতে দাঁড় করানো নিজেকে। চাই সে বড় হোক কিবা ছোট হোক, চাই বৃদ্ধ হোক কিংবা যুবক। প্রত্যেকের হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে দেখো। কারো মন বলছে, সে পঞ্চাশ বছর নামাজ পড়ে না। কারো মন বলছে, সে চল্লিশ বছর নামাজ পড়ে না। কারো মন বলছে, সে ত্রিশ বছরে একদিনও মসজিদে যায়নি। একবারও দাঁড়ায়নি আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে। হায়! কী করুণ পরিণতি আজ মুসলিম উম্মাহর সদস্যদের। ধ্বংস ও পতনের কোন অতল গহ্বরে তারা নিমজ্জিত হয়ে আছে।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের নামাজের প্রতি যত্নবান হওয়ার তাওফিক দিন। মসজিদের সাথে আমাদের হৃদয়ের গভীর সম্পর্ক তৈরি করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের আপনার সেসব প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন যারা নামাজের প্রতি যত্নবান। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের বর্তমান অবস্থা পরিবর্তন করে দিন। আপনি আমাদের সিরাতে মুসতাকিমের ওপর অটল ও অবিচল রাখুন।

---

১৩ সুরা মুদ্দাছছির: ৪২

নামাজের প্রতি যত্নবান না হওয়ার কারণ

নামাজের প্রতি যত্নবান না হওয়ার অন্যতম কারণ হলো, অসৎ ও মন্দ লোকদের সংস্পর্শ। যুবকদের চরিত্র ও মানস গঠনে সংস্পর্শ ও সান্নিধ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ভালো ব্যক্তিদের সংস্পর্শে মানুষ ভালো ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী হয়। মন্দ ও খারাপ ব্যক্তিদের সংস্পর্শে মানুষ নষ্ট ও দুশ্চরিত্রের অধিকারী হয়। বর্তমান মুসলিম যুব ও তরুণ প্রজন্মের নষ্ট ও চরিত্রহীন হওয়ার পেছনে অন্যতম কারণ হলো, অসৎ ও মন্দ লোকদের সংস্পর্শ। সংস্পর্শ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে সৎ ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে আদেশ করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনদের সৎ বন্ধু নির্বাচন করতে বলেছেন। মন্দ ও অসৎ বন্ধুদের থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। সংস্পর্শের রয়েছে আশ্চর্য প্রভাব। সৎ ব্যক্তির সংস্পর্শে খারাপ মানুষ ভালো হয়ে যায়। পক্ষান্তরে অসৎ ব্যক্তির সংস্পর্শে ভালো মানুষ খারাপ হয়ে যায়। বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক রচিত হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। মুমিনের সকল কাজের লক্ষ্য হবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি। কারো সাথে সম্পর্ক তৈরি হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আবার সম্পর্ক ছিন্ন হবে আল্লাহর জন্য। সৎ ও নামাজি ব্যক্তির সংস্পর্শে যে নামাজ পড়ে না সেও নামাজের প্রতি যত্নবান হবে। আল্লাহর বিধি-বিধান পালনের প্রতি সচেষ্ট হবে। আজ কোন জিনিস আমাদের নামাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে। মুমিন কেন নামাজের প্রতি যত্নবান হচ্ছে না? এর কারণ হলো, অসৎ ও মন্দ লোকদের সংস্পর্শ। আমরা তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করছি যারা নামাজ পড়ে না। যারা আল্লাহর আদেশ পালন করে না। নিষেধ থেকে বেঁচে থাকে না। যাদের অন্তরে নেই আল্লাহ ও তার রাসুলের ভালোবাসা। ইসলামের বিধি-বিধান পালনের প্রতি যারা চূড়ান্ত উদাসীন। আমরা বন্ধু বানাচ্ছি তাদের যাদের অন্তর মৃত। যারা প্রবৃত্তির পূজা করছে।

হে মুসলিম যুবক! আমি তোমাদের সতর্ক করছি যেন তোমরা অসৎ সংস্পর্শ ত্যাগ করো। যেন তোমরা মন্দ লোকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো। তুমি যার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করছ তার প্রভাব তোমার ওপর অবশ্যই পড়বে। এ কথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। অনেক ব্যক্তিকে বাহ্যিকভাবে অত্যন্ত ভালো মনে হয়। তার বাহ্যত চালচলন চলাফেরা দেখে মনে হয় অনেক সুন্দর। তার স্বভাব-চরিত্রকে ধারণা করা হয় নিষ্কলুশ। কিন্তু প্রকৃতার্থে তারা

ভালো মানুষ নয়। এক ব্যক্তি আমাকে একটি ঘটনা শুনিয়েছেন। তিনি ছিলেন একটি কোম্পানির মালিক। তিনি বলেন, আমার একজন কর্মচারী রয়েছে যার চলাফেরা অত্যন্ত মার্জিত। তার স্বভাব-চরিত্র উন্নত। কিন্তু তার একটি সমস্যা রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম কী সমস্যা? তিনি বললেন, সে মসজিদে যায় না এবং নামাজ পড়ে না। আমি বললাম, এ তো খুব খারাপ একটি গুণ। এটি এমন একটি মন্দ অভ্যাস যার কারণে সে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিদের নাম থেকে তার নাম বাদ পড়ে যায়। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা সে-সমস্ত লোকদের প্রকৃত রিজাল তথা ব্যক্তি বলে মনোনিত করেছেন যারা নামাজ আদায় করে। কিছুক্ষণ পর সে কর্মচারী শরীরচর্চা করে জিম থেকে বেরিয়েছে। মালিক আমাকে ইশারা করে তাকে দেখালেন। আল্লাহ তায়ালা এমন লোকদের লক্ষ্য করেই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ
كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ
الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

'তুমি যখন তাদের দেখো তাদের দেহ তোমাকে মুগ্ধ করে এবং তারা যদি কথা বলে তুমি তাদের কথা শোনো। তারা দেয়ালে ঠেকানো কাঠের মতো। তারা প্রতিটি আওয়াজকে তাদের বিরুদ্ধে মনে করে। তারাই শত্রু; অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন, তারা কীভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছে।' [১৪]

আমি তাকে সালাম দিয়ে বললাম, হে যুবক! তোমার মালিক আমার নিকট তোমার অনেক প্রশংসা করেছে। এ শুনে সে বেশ খুশি হলো। তার চেহারায় আনন্দের আভা ছড়িয়ে পড়ল। অতঃপর আমি বললাম, তবে একটি দোষের কথা বলেছে। এ কথা শুনে সে ভারি চমকে উঠল। বলল, কী সে দোষ? আপনি বলুন আমি তা সংশোধন করে নেব। তখন আমি তার অবস্থা দেখে

১৪ সুরা মুনাফিকুন: ৪

আশ্চর্য হলাম। মালিকের সামনে মাত্র একটি দোষ সংশোধন করার জন্য সে কত পাগলপ্রায় হয়ে উঠল। তার মধ্যে কত সচেতনতা পরিলক্ষিত হলো। কিন্তু প্রকৃত মালিক যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, প্রতিনিয়ত যিনি তার খাদ্য-পানীর ব্যবস্থা করছেন সে মালিকের সামনে তার বহু দোষ রয়েছে, সেগুলো সংশোধনের প্রতি তার বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই। আমি তাকে বললাম, তুমি নাকি মসজিদে যাও না এবং নামাজ পড় না? সে বলল, হে শাইখ! আপনি সত্য বলেছেন। আমি মসজিদে যাই না এবং নামাজ পড়ি না। এটি আমার ব্যর্থতা। আমি বললাম, না, এটি তোমার ব্যর্থতা নয়। ব্যর্থতা ও ক্ষতির মাঝে পার্থক্য রয়েছে। তুমি স্পষ্ট ক্ষতি ও ধ্বংসের মাঝে রয়েছ। ব্যর্থতা তো সেটি যে, আমি তাকবিরে তাহরিমা পেলাম না। জামাতের সাথে ফজরের নামাজ পড়তে পারলাম না, তারপর একাকী পড়ে নিলাম। ব্যর্থতা হলো সেটি যে, কোনো কারণে সময়মতো নামাজ পড়তে পারলাম না, পরে তার কাজা আদায় করে নিলাম। এর নাম ব্যর্থতা। কিন্তু তুমি তো মসজিদেই যাও না, নামাজই পড় না। এর অর্থ তো ব্যর্থতা নয়। এ হলো ধ্বংস। তুমি স্পষ্ট ধ্বংসের মাঝে আছ। জেনে রেখো! তোমার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

বর্তমানে অধিকাংশ মানুষের অবস্থাই এমন। তাদের ভালো মনে করা হচ্ছে কিন্তু তাদের প্রকৃত অবস্থা হলো এই যুবকের মতো। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ * وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ

> 'করুণাময় আল্লাহর স্মরণ থেকে যে বিরত থাকে তার জন্য আমি শয়তানকে নিয়োজিত করি। অতঃপর সেই হয় তার সহচর। শয়তানেরাই মানুষকে সৎপথ থেকে বিরত রাখে; আর মানুষেরা মনে করে যে, তারা সৎপথে আছে।'[১৫]

---

১৫ সুরা যুখরুফ: ৩৬

মসজিদে যায় না, নামাজ পড়ে না, তবুও মানুষ তাকে ভালো মনে করছে। এ কেমন গুণ যে তাকে ভালো বলা হবে। অতঃপর তাকে বললাম, হে যুবক! তুমি ধ্বংসের মধ্যে আছ। তুমি মসজিদে যাও, নামাজ পড়ো। সৎ লোকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করো। অসৎ লোকদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করো। তুমি তোমার নিজেকে জিজ্ঞেস করো, তুমি কোন পথে আছ। তুমি কি কল্যাণের পথে আছ নাকি ক্ষতি ও ধ্বংসের মাঝে আছ? সে আমার থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। আল্লাহু আকবার! পরবর্তী নামাজের জন্য মুয়াজ্জিন আজান দিলেন। নামাজিগণ মসজিদের দিকে ছুটে আসছেন। আমি দেখি, সে যুবক যাকে কিছুক্ষণ পূর্বে নামাজের প্রতি আহ্বান করেছি, ধ্বংসের পথ থেকে কল্যাণের পথে ফিরে আসতে বলেছি, সে সুন্দর ও শুভ্র পোশাক পরিধান করে মসজিদের দিকে ছুটে আসছে। প্রকৃত জ্ঞানী তো তারাই, যাদের সতর্ক করা হলে তারা নিজেদের সংশোধনে ব্রতী হয়।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আমরা কেউ জানি না, কখন আমাদের মৃত্যু হবে। কখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবো আখেরাতে। জানি না, কখন জীবনে দুয়ারে এসে দাঁড়াবে মৃত্যুর ফেরেশতা। একদিন আকস্মিক মৃত্যু এসে কড়া নাড়বে দুয়ারে। হে নামাজের প্রতি উদাসীন ব্যক্তি! তুমি কি চাও, নামাজের প্রতি উদাসীন অবস্থায় তোমার মৃত্যু হোক? তুমি কি চাও, আল্লাহর আদেশ-নিষেধের প্রতি গাফেল অবস্থায় তোমার জীবনের অবসান হোক? না, কেউই চায় না এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হোক। সুতরাং করণীয় হলো অবস্থার পরিবর্তন করা। নিজেকে সংশোধন করা। নামাজের প্রতি যত্নবান হওয়া। এক ব্যক্তি যে নামাজের প্রতি উদাসীন ছিল, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি কি চাও, এমতাবস্থায় তোমার মৃত্যু হোক? সে বলল, না। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুকি কি চাও তোমার এ অবস্থার পরিবর্তন হোক তারপর তোমার মৃত্যু হোক? সে বলল, এখনো আমার মন তৈরি হয়নি। তারপর জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি কি জানো যে, এমতাবস্থায় তোমার মৃত্যু আসবে না? সে বলল, না। আল্লাহর শপথ! কোনো জ্ঞানী চাইবে না যে, এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হোক। সুতরাং তুমি তোমার বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন করো। নামাজের প্রতি যত্নবান হও। উপদেশ গ্রহণ করো এবং সে অনুযায়ী আমল করো। উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। যারা উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ * كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ *
فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ

'তাদের কী হয়েছে যে, তারা উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? যেন তারা ভয় পেয়ে পলায়নকারী গাধা। যারা কোনো সিংহের ভয়ে পালিয়ে এসেছে।' ১৬

এর থেকে উত্তরণ ও পরিত্রাণের উপায় হলো, বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করা। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم
الآخرة

'জেনো! আমি তোমাদের কবর জিয়ারত থেকে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু এখন তোমরা কবর জিয়ারত করো। কেননা, কবর জিয়ারত তোমাদের আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেবে।'

আজ মানুষের গাফলত ও উদাসীনতার অন্যতম কারণ হলো, মৃত্যুকে ভুলে যাওয়া। মানুষ মৃত্যুর কথা ভুলে গেছে। জেনে রাখো! প্রত্যেককেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। প্রত্যেকের জন্যই অপেক্ষা করছে মৃত্যু। আকস্মিক একদিন মৃত্যু এসে দুয়ারে হাজির হবে। যখন মৃত্যু চলে আসবে তখন যতই চিৎকার করে আল্লাহকে ডাকা হোক না কেন তিনি তখন সাড়া দেবেন না। তাই মৃত্যুর ফেরেশতা আসার পূর্বেই তোমরা তোমাদের রবের দিকে ফিরে এসো। নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করো। আর অবস্থার পরিবর্তনের জন্য অন্যতম মাধ্যম হলো, মৃত্যুর কথা স্মরণ করা। মৃত্যুর কথা তখনই বেশি স্মরণ হবে যখন কবর জিয়ারত করবে। মৃত ব্যক্তির কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। তখন হৃদয়ে জাগ্রত হবে এ কথা, একদিন যে ব্যক্তি দুনিয়াতে ছিল আজ সে অন্ধকার কবরে। তার ন্যায় একদিন আমাকেও চলে যেতে হবে। হে যুবক! আজ তুমি অন্যের কবর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো, একদিন মানুষ তোমার কবর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার পূর্বে।

---

১৬ সুরা মুদ্দাছছির: ৪৯

অসুস্থ ব্যক্তিদের দেখতে যাও। দেখো, তাদের কোন কোন নেয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। দেখো, তাদের কারো চোখ নেই। কারো পা নেই। কেউ শুনতে পায় না। তারপর নিজের দিকে তাকাও। আল্লাহ তায়ালার অশেষ কৃতজ্ঞতা আদায় করো। এক ছিল কুলি। বাজারে লোকদের ভারী ভারী বস্তু মাথায় বহন করে নিয়ে যেত। বিনিময়ে তাদের থেকে কিছু অর্থকড়ি পেত; তা দিয়ে তার সংসার চলত। সে মসজিদে যেত না। নামাজ পড়ত না। একদিন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি কেন নামাজ পড় না? সে বলল, আমি আমার মন অনুযায়ী চলি। আমার নামাজ পড়তে ইচ্ছে করে না তাই নামাজ পড়ি না। এই ছিল তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ জবাব। একদিনের ঘটনা। খুব ভারী এক বস্তু মাথায় নিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে পা পিছলে পড়ে যায়। তৎক্ষণাৎ তার একটি পা ভেঙে যায়। তারপর দীর্ঘদিন অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার এখন কী করতে ইচ্ছে করে? সে বলল, আমার নামাজ পড়তে ইচ্ছে করে। মুয়াজ্জিন আজান দিলে আমার মসজিদে যেতে ইচ্ছে করে। সে যখন সুস্থ ছিল তখন নামাজ পড়েনি। আজ যখন অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে আছে তখন তার নামাজ পড়তে ইচ্ছে করছে। তখন সুযোগ ছিল কিন্তু নামাজ পড়েনি। মসজিদে যায়নি। আজ ইচ্ছে করলেও সে মসজিদে যেতে পারছে না। সুতরাং হে যুবক! সময় থাকতেই নিজেকে পরিবর্তন করো। নামাজের প্রতি যত্নবান হও। সময় ফুরিয়ে যাওয়ার পূর্বেই সময়ের সৎ ব্যবহার করো। মৃত্যু আসার পূর্বেই মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করো।

উদাসীনতা এক ভয়ংকর রোগ

মানুষের শরীরে যেসব রোগ বাসা বাঁধে তা দুই প্রকার। শারীরিক ও আত্মিক। শারীরিক রোগ থেকে সুস্থতার জন্য মানুষ দুনিয়ার ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়। হাসপাতালে ভর্তি হয়। ডাক্তারের নিকট গিয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করলে রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করে। এ রোগ যতই মারাত্মক হোক না কেন, চিকিৎসা বিজ্ঞান এর ঔষধ আবিষ্কার করেছে। আজকের পৃথিবীতে শারীরিক রোগ তেমন ভয়ংকর কোনো রোগ নয়। প্রতিনিয়তই মানুষ নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এবং যথারীতি আরোগ্য লাভ করছে। জরাজীর্ণ জীবন থেকে ফিরে আসছে সুস্থ জীবনে। শারীরিক সুস্থতা-অসুস্থতার সম্পর্ক নিছক পার্থিব জীবনের সাথে। পরকালের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। মৃত্যুর সাথে সাথে জীবনের ন্যায় পরিসমাপ্তি ঘটে দৈহিক সকল রোগের।

পক্ষান্তরে আত্মার রোগ হলো সর্বাধিক ভয়ংকর রোগ। দুনিয়ার বড় থেকে বড় কোনো ডাক্তারের নিকট গেলে এ রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা যায় না। উন্নত বিশ্বের নামিদামি হাসপাতালে নেই এর চিকিৎসা। চিকিৎসাবিজ্ঞান আত্মিক রোগের কোনো ঔষধ আজ অবধি আবিষ্কার করতে পারেনি। কেয়ামত পর্যন্ত তারা এর প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে পারবে না। আত্মিক রোগ এতই ভয়ানক যে, এ রোগ বান্দার অন্তরকে ধ্বংস করে দেয়; যা অদৃশ্য ও লুক্কায়িত। ধ্বংস করে দেয় বান্দার আখেরাত। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে মানুষকে বিচ্যুত করে দেয়। সিরাতে মুসতাকিম থেকে বিচ্যুত করে ভ্রষ্টতা ও শয়তানের পথে পরিচালিত করে। আত্মার রোগ মানুষকে তার সফলতা ও কল্যাণের পথ থেকে সরিয়ে দেয়। আল্লাহর আনুগত্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। নেক আমল থেকে উদাসীন করে রাখে। তাকে ভুলিয়ে দেয় মৃত্যুর কথা। আর যে মৃত্যু ও পরবর্তী জীবনের শাস্তিকে ভুলে যায় তার জন্য সকল গোনাহ ও নাফরমানি সহজলভ্য হয়ে যায়। এ রোগ তাই শারীরিক রোগ থেকে অত্যধিক ভয়ংকর।

আজ অধিকাংশ মানুষ আত্মিক রোগে আক্রান্ত। চতুর্পাশে যেদিকে তাকাই সেদিকেই দেখি রোগী, রোগী এবং রোগী। না, আমি শারীরিক রোগের কথা বলছি না, বলছি আত্মিক রোগের কথা। সকালে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে তারা বেরিয়ে যাচ্ছে আপন কর্মস্থলে। দিনমান দুনিয়ার জন্য গাধার মতো খেটে

সন্ধ্যায় ঘরে ফেরে। সকল প্রচেষ্টা ও শ্রম তাদের পার্থিব জীবনের জন্য। দুনিয়ার পেছনে তারা এতই মত্ত যে, মৃত্যুর কথা একদমই মনে পড়ে না তাদের। মনে পড়ে না আখেরাতের কথা। মহাপ্রলয়, হাশর, পুলসিরাতের কথা। তাদের মনে পড়ে না সেদিনের কথা, যেদিন সূর্যকে রাখা হবে মাথার উপরে। আসমান জমিনের ব্যবধান সেদিন ঘুচিয়ে আনা হবে। সেদিন তাদের কী পরিণতি হবে তারা বেমালুম ভুলে গেছে। গাফলতের উপত্যকায় তারা অনবরত ঘুরছে উদ্ভ্রান্তের ন্যায়। আর অমনি হঠাৎ তাদের কাছে এসে মৃত্যু হাজির হয়। তখন সম্বিত ফিরে আসে তাদের কিন্তু তখন আর কিছুই করার নেয়। জীবন তো ফুরিয়ে গেছে। সময় তো নিঃশেষ হয়ে গেছে। তখন চিৎকার করলেও কোনো লাভ নেই। কেউ শুনবে না তোমার আকাশ বিদীর্ণ করা চিৎকার। আর্তনাদ করলেও সাড়া দেবে না তোমার পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজন কেউ। দেখো! আজ চারপাশের মানুষ বড় উদাসীনতায় ডুবে আছে। তাদের উদাসীনতা থেকে তাদের ফিরিয়ে আনতে এবং মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিতে কেউ এসে সতর্ক করে যায়। তাদের হৃদয়ে চাবুক মেরে করাঘাত করে যায়। জোরে চিৎকার করে আহ্বান করে। দরদ ও ভালোবাসার পরশ মেখে পিঠে হাত ভুলিয়ে আদর করতে থাকে আর সতর্ক করতে থাকে। তারা তুলে আনতে চায় তাদেরকে গাফলতের গর্ত থেকে। ফিরিয়ে আনতে চায় উদাসীনতার বেড়াজাল থেকে। তারা তাদের অসুস্থ আত্মার চিকিৎসা করাতে চায়। আত্মার জখমে উপশমের মলম লাগাতে চায়। তারা তাদের ডেকে বলে, যেন তারা আত্মার ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়। নিজেদের অসুস্থ আত্মাকে সুস্থ করে তোলে।

গাফলত বড় ধ্বংসাত্মক রোগ। বড় ভয়ংকর রোগ। এ রোগ যার দেহে বাসা বাঁধে তার ইহ ও পারলৌকিক উভয় জীবন ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে গাফলতের চাদর ছিঁড়ে অবাধ্যতার প্রান্তর থেকে শাশ্বত আলো ও চিরকল্যাণের পথে ফিরিয়ে আনতে ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের সম্পদ, তোমাদের সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ না রাখে। আর যে এমনটি করবে তারা চূড়ান্ত ক্ষতিগ্রস্ত।' [১৭]

হে আল্লাহর বান্দাগণ! মানুষ কেন উদাসীন হয়? কোন জিনিস মানুষকে গাফলতের মাঝে ডুবিয়ে রাখে? মানুষ কীভাবে আক্রান্ত হয় আত্মিক রোগে? আত্মার রোগ কীভাবে তৈরি হয় দেহে?

জেনে রেখো! এসবের মূলে হলো দুনিয়া। দুনিয়ার মোহ ও রঙিন লালসা মানুষকে গাফেল ও উদাসীন করে তোলে। দুনিয়ার মোহে যে মত্ত হয়ে পড়ে সে ভুলে যায় মৃত্যুর কথা। ভুলে যায় আমলের কথা। পরকালের কথা তার স্মরণ হয় না। স্মরণ হয় না জাহান্নামের কঠিন শাস্তির কথা।
আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন,

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ ۗ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۖ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ

'মানুষের হিসাব গ্রহণের সময় ঘনিয়ে এসেছে; অথচ তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে আছে। তাদের কাছে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে নতুন যে উপদেশই আসে তারা তা শ্রবণ করে খেলার ছলে। উদাসীন অন্তরে। জালেমরা গোপনে বলাবলি করছে যে, সে তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ; এমতাবস্থায় দেখে শুনে তোমরা তার যাদুর কবলে কেন পড় ?'।[১৮]

---

১৭ সুরা মুনাফিকুন: ৯

১৮ সুরা আম্বিয়া: ১-৩

হায়! কবর যদি কথা বলতে পারত তাহলে দুনিয়ার মানুষকে ক্রমাগত ডেকে ডেকে বলত, তোমরা আখেরাতের পাথেয় গ্রহণ করো। আর আখেরাতের উত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া। কবর যদি কথা বলতে পারত তাহলে মানুষকে ডেকে বলত, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো। তার অবাধ্যতা ছেড়ে দাও। পার্থিব জীবনকে সঠিক কাজে ব্যবহার করো। দুনিয়ার জীবন যখন একবার চলে যাবে আর ফিরে আসবে না। কবর মানুষকে ডেকে বলত, তোমরা গাফলতের চাদর ভেদ করে বেরিয়ে আসো। দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের জন্য গনিমত মনে করো। আখেরাতের অনন্ত জীবনের সামানা সঞ্চয় করো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতকে এ কথাই বলেছেন,

اغتنم خمساً قبل خمس: اغتنم الحياة قبل الممات، اغتنم الشباب قبل الهرم، اغتنم الصحة قبل المرض، اغتنم الفراغ قبل الانشغال، اغتنم الغنى قبل الفقر

'হে মানুষ! পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের পূর্বে গনিমত মনে করো। জীবনকে মৃত্যু আসার পূর্বে। যৌবনকে বার্ধক্যের পূর্বে। সুস্থতাকে অসুস্থতার পূর্বে। অবসরকে ব্যস্ততার পূর্বে। ধনাঢ্যতাকে দারিদ্রতার পূর্বে।'[১৯]

অপর হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো অধিকতর সতর্ক করে বলেন,

الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والجاهل من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله الأماني

'প্রকৃত বুদ্ধিমান সে ব্যক্তি, যে প্রবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকে এবং এমন আমল করে যা তার মৃত্যুর পর কাজে আসবে। আর মূর্খ সে ব্যক্তি, যে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে।'[২০]

---

১৯ *মুসতাদরাকে হাকেম*: ৭৮৪৬

২০ *সহিহ মুসলিম*: ২৮২২

হে আল্লাহর বান্দাগণ! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসকে মানদণ্ড নির্ধারণ করে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো, দুনিয়ার কত কত মানুষ আজ উদাসীনতায় ডুবে আছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদিসই বলে দেয় এ কথা যে, দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ আজ নিজেদের করণীয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। তারা তাদের দায়িত্বের কথা বেমালুম ভুলে আছে। কর্তব্যের জায়গা থেকে সরে গেছে যোজন যোজন। আমলের কথা ভুলে আছে। ভুলে আছে মৃত্যুর কথা। কবরের কথা। পরকালের হিসাব গ্রহণের কথা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে গনিমত মনে করতে বলেছেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জীবনের করণীয় সম্পর্কে উদাসীন হয়ে আছে।

গাফলতের নিদর্শন

হে আল্লাহর বান্দা! গাফলতের কতিপয় নিদর্শন রয়েছে, যা দেখে নির্ধারণ করা যায়, কে গাফেল আর কে সতর্ক। হে যুবক! তুমি তাকিয়ে দেখো তোমার নিজের দিকে, খুঁজে পাও কিনা গাফলতের কোনো একটি প্রমাণ। গাফলতের প্রথম নিদর্শন হলো, নামাজ না-পড়া। নামাজের প্রতি যত্নবান না-হওয়া। নামাজের সময় অলসতা ও অবহেলার ঘুমে বিভোর থাকা। মসজিদ থেকে যখন আল্লাহু আকবারের স্বরে মধুর আজান ভেসে আসে তখনও দুনিয়াবি কাজে মশগুল থাকা। খেল-তামাশায় ডুবে থাকা। হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে উদাসীন হয়ে ঘুরতে থাকা। কিন্তু দুনিয়ায় আজ কত অগণিত মুসলমান। কিন্তু মসজিদে আসে কতজন? মসজিদের মিনার থেকে যখন নামাজের জন্য আহ্বান করা হয় তখন কয়জন ছুটে আসে মসজিদের দিকে? হ্যাঁ! তাদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য।

মসজিদ আজ শূন্য পড়ে আছে। দীর্ঘ কাতারগুলো পড়ে থাকে নামাজিবিহীন ফাঁকা। আল্লাহু আকবারের ধ্বনি তাদেরকে গাফলতের ঘুম থেকে জাগ্রত করতে পারে না। মিনারের আজান তাদের কর্মের আসর থেকে তুলে আনতে পারে না। রাতের নিদ্রা ভেঙে তারা আসে না কল্যাণের দিকে। তাদের সংখ্যা আজ অনেক। তাদের সংখ্যা বেড়ে চলছে প্রতিনিয়ত।

একটি দুঃখজনক ঘটনা বলি। কিছুদিন আগে একজন লোক এলো আমার নিকট। জিজ্ঞেস করল, হে শাইখ! যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে না তার হুকুম কী? আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ঘটনা কী, খুলে বলো। সে তখন বলল, কিছুদিন পূর্বে এক ব্যক্তি মারা গেছে। তার বয়স ছিল সত্তর। কিন্তু সে নামাজ পড়ত না। তার দীর্ঘ জীবনে আমি কখনো তাকে মসজিদে আসতে দেখিনি। কোনোদিন তাকে নামাজের কাতারে দাঁড়ানো দেখিনি।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! এ হলো আজকে আমাদের অবস্থা! সত্তর বছর বয়সে একজন মুসলমান ইন্তেকাল করেছে। কিন্তু কোনোদিন সে মুসলমানদের মসজিদে আসেনি। কোনোদিন তার সৌভাগ্য হয়নি হাত বেঁধে আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার। তার সৌভাগ্য হয়নি আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালাকে একটি রুকু করার। একবারও সে রবের সামনে নত করেনি তার মাথা। এর চেয়ে আফসোস আর কি হতে পারে। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এমনই দুর্ভাগ্যের জীবনযাপন করছে আজ অগণিত মানুষ। আফসোসের মৃত্যু নিয়ে তারা চলে যাচ্ছে দুনিয়া ছেড়ে। পরকালে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে নিদারুণ অসহায়ত্ব। কঠিন আজাব তাদের জন্য রব প্রস্তুত করে রেখেছেন। জীবনে একবারও মসজিদে আসার তাওফিক হয়নি। হ্যাঁ, এটিই গাফলতের জিন্দেগি। উদাসীনতার চাদরে ঢাকা এক অভিশপ্ত জীবন।

জনৈক ব্যক্তি প্রত্যহ শেষ রাত্রিতে গ্রামের একটি উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে নামাজের জন্য লোকদেরকে ডাকত। আর তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিত মৃত্যুর কথা। পরকালের কথা। লোকটি তাদেরকে ঘুম ছেড়ে নামাজের জন্য জাগ্রত হওয়ার জন্য উদাত্ত আহ্বান করত। কিন্তু প্রতিদিনের ন্যায় একদিন সে ডাক ভেসে আসছে না। রাতের শেষ তখন। পেরিয়ে যাচ্ছে পবিত্র সুবহে সাদিক। ভোর সমাগত। কিন্তু প্রতিদিনের মতো লোকটি গ্রামবাসীকে ডাকছে না। তাদের নামাজের জন্য জাগ্রত হতে প্রেমার্ত আহ্বান জানাচ্ছে না। তার সে হৃদয়বিদারক ডাক গ্রামের ঘরবাড়ি, গাছপালার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে না সুকরুণ আবেদন জানিয়ে। গ্রামের সর্দারকে বিষয়টি ভাবিয়ে তুলল। কিছুটা বিচলিত হলো সর্দার। খবর আনতে পাঠাল তার এক সিপাহিকে। সিপাহি এসে গ্রামের সর্দারকে শোকার্ত কণ্ঠে বলল, লোকটি গতকাল মারা গেছে। গ্রামের সর্দার তখন নিদারুণ আক্ষেপের স্বরে বলল, যে আমাদের মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিত আজ সেই চলে গেছে দুনিয়া ছেড়ে।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! পবিত্র সেই সত্তার শপথ যিনি সৃজন করেছেন তাবৎ কিছু! এটিই বাস্তবতা। চিরসত্য বাস্তবতা। এখানে যে আসবে সেই চলে যাবে। কেউ থাকতে পারেনি কখনো। পারবেও না কেউ। এটি থাকার জায়গা নয়। দুনিয়া প্রস্থানের জায়গা। দুনিয়াতে কেউ চিরদিন থাকতে পারবে না। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা পবিত্র কুরআনে তার ওইসব বান্দাদের নিন্দা করেছেন যারা দুনিয়াতে দীর্ঘদিন থাকার স্বপ্ন পোষণ করে।

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

'তাদের আহার করতে, ভোগ করতে আর আশায় ভুলে থাকতে দাও। অচিরেই তারা জানতে পারবে।'[২১]

দুনিয়াতে যারা দীর্ঘদিন থাকার আশা করে, দুনিয়ার প্রতি যাদের লালসা ও মোহ তীব্র তারা উদাসীন। তারা নামাজ পড়ে না। রুকু করে না। নত হয় না আল্লাহর সম্মুখে। সেজদা করে না। মসজিদে তাদের আগমন হয় না। দুনিয়ার মায়ায় তারা এত মত্ত থাকে যে, মসজিদের ঘোষণা তাদের টেনে আনতে পারে না। সম্পদের লালসা তাদের এতই গ্রাস করে রাখে যে, কাজ-কর্ম রেখে নামাজের জন্য মসজিদে ছুটে আসতে তাদের সময় হয় না।

একদিন আমি পথ চলছিলাম। পথে অনেকগুলো তরুণ বয়সি ছেলের সাথে আমার দেখা হলো। আমি তাদের কাছে ডাকলাম। তাদের সাথে আমার যে কথা হলো তা আমি আপনাদের বলছি।
আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কী করছ এখানে?
তারা বলল, আমরা এখানে কাজের তালাশে এসেছি।
তারপর আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কি নিয়মিত নামাজ পড়? আমি আল্লাহর কিতাব ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর প্রতি আস্থা রেখে এ কথা বলতে পারি, নামাজ হলো সকল বরকতের মূল। যে নামাজ পড়ে তার জন্য আল্লাহ তায়ালা উত্তম রিজিকের ব্যবস্থা করে দেন। অকল্পনীয় জায়গা থেকে আল্লাহ তায়ালা তার রিজিকের বন্দোবস্ত করে দেন।

---

২১ সুরা হিজর: ৩

এবং দুনিয়া আখেরাতে সম্মানিত করেন তাকে। নামাজ হলো বরকতের চাবিকাঠি।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

'তোমার পরিবার-পরিজনকে নামাজের আদেশ দাও এবং নিজে তাতে অটল থাকো। আমি তোমার কাছে কোনো জীবিকা চাচ্ছি না। আমিই তোমাকে জীবিকা দিয়ে থাকি। আর শুভ পরিণাম তাদের জন্য যাদের হৃদয়ে আছে তাকওয়া-খোদাভীতি।' [২২]

যুবকদের মধ্যে প্রথমজন বলল, হে শাইখ! আমি কি সত্য বলব নাকি মিথ্যা বলব? আমি বললাম, যদি মিথ্যা বলো তাহলে এর পরিণাম তোমাকেই ভোগ করতে হবে।

এ শুনে যুবকটি বলল, হে শাইখ! সত্য বলছি আমি নামাজ পড়ি না!
আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি কাফের?
যুবকটি বলল, না, আমি মুসলমান।
আমি বললাম, তাহলে তুমি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও নামাজ পড় না কেন? তুমি কি জানো না রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমান ও কাফেরের মাঝে পার্থক্য করেছেন নামাজের মাধ্যমে?

العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر

'আমাদের মাঝে এবং তাদের মাঝে অঙ্গীকার হচ্ছে নামাজ। সুতরাং যে নামাজ ছেড়ে দিয়েছে সে কাফের হয়ে গেছে।'[২৩]

---

৪ সুরা তহা: ১৩২

২৩. *মুসনাদে আহমদ*। এ হাদিসের মাধ্যমে নামাজের গুরুত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। ঈমানের পর সর্বোত্তম ইবাদত হলো নামাজ। নামাজ পরিত্যাগকারীর ভয়াবহ পরিণাম ও ইসলামের ব্যাপারে তার ঈমানের দুর্বলতা বর্ণনা করতেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কঠোর

এবার দ্বিতীয় যুবকটি বলল, হে শাইখ! আমি তার চেয়ে ভালো।
আমি বললাম, কীভাবে?
সে বলল, আমি দৈনিক দুই ওয়াক্ত নামাজ পড়ি।
আমি বললাম, এ তো ভারি আশ্চর্যের কথা যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের ওপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। আর তুমি কিনা দিনে পড় মাত্র দুই ওয়াক্ত! এ কেমন উদাসীনতা? হে যুবক! তুমি কি জানো না ইসলামের ভিত্তি রাখা হয়েছে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ওপর?

তৃতীয়জনের অবস্থা তো আর ভারি আশ্চর্যের! সে বলল, আমি নিয়মিত সাপ্তাহিক জুমার নামাজ পড়ি। প্রতি জুমায় নিয়ম করে একবার মসজিদে যাই। আমি বললাম, ইন্নালিল্লাহি...

এই হলো আজ মুসলিম যুবকদের অবস্থা। ছোট-বড়, যুবক-বৃদ্ধ সকলের অবস্থা এর চেয়ে ভিন্ন কিছু নয়। এর চেয়ে দুঃখজনক আর কি হতে পারে যে, মুসলমান অথচ নামাজের ব্যাপারে গাফেল। আল্লাহর কসম! এর চেয়ে বড় গাফলত আর হতে পারে না। নামাজের মাধ্যমে পার্থক্য করা যাবে, কে গাফেল আর কে সতর্ক। কে উদাসীন কে জাগ্রত। হে যুবক! তুমি নিজেকে যাচাই করে নাও। তুমি তোমার ঈমান ও আমলের ব্যাপারে গাফেল নাকি জাগ্রত? ভেবে দেখো! আজকের ফজরের নামাজের সময় তুমি কোথায় ছিলে? মসজিদের প্রথম কাতারে নাকি উদাসীনতার চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমের ঘোরে?

মসজিদের মিনার থেকে প্রতিদিন পাঁচবার আজান ভেসে আসে আমাদের কর্ণকোহরে। কিন্তু আমাদের অন্তরে কোনো প্রকার বোধোদয় ঘটে না। দৈনিক পাঁচবার মুয়াজ্জিন আল্লাহর নামে ডেকে ডেকে বলে, এসো কল্যাণের পথে! এসো কল্যাণের পথে! কিন্তু কল্যাণের ডাক আমাদেরকে আমাদের গাফলত থেকে টলাতে পারে না। আমরা নামাজ থেকে যত দূরে সরে যাচ্ছি আমাদের পরিণাম তত খারাপ হচ্ছে। আমাদের ভাগ্য তত মন্দ হচ্ছে। আমাদের ঈমান তত দুর্বল হচ্ছে। ফজরের সময় যখন মসজিদ থেকে আজান ভেসে আসে আমরা তখন অলস ঘুমের ঘোরে মৃত হয়ে পড়ে থাকি।

হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। যে মুসলমান নামাজ পড়বে না তার ঈমান পরিপূর্ণ নয়। এর দ্বারা সে কাফের হবে না। হ্যাঁ, কেউ যদি নামাজকে অস্বীকার করে তাহলে কাফের হয়ে যাবে।

মধ্য দিবসে যখন জোহরের জন্য মুয়াজ্জিন মসজিদের মিনার থেকে আমাদের ডাকেন। তখন আমরা কর্মের ব্যস্ততায় ডুবে থাকি। এভাবে বিকেল, সন্ধ্যা এবং রাতের প্রথম প্রহরেও আমরা পরিবার-পরিজনকে নিয়ে মত্ত থাকি আরাম-আয়েশে। এসবই আমাদের গাফলতের নিদর্শন। গাফলত আমাদের জীবনের চূড়ান্ত মাকসাদকে পুড়িয়ে ফেলছে। ধ্বংস করে দিচ্ছে আখেরাতকে। তাদের দিকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ

'আমি জাহান্নামের জন্য অনেক জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি।'[২৪]

কত আফসোস! মুসলমান আজ নামাজ পড়ে না। মুসলমানদের মসজিদগুলো পড়ে আছে রিক্ত হয়ে। বিরান হয়ে যাচ্ছে কত মসজিদ। মসজিদের কাতারগুলো ফাঁকা। হৃদয় সীমাহীন যন্ত্রণায় আহ করে ওঠে। চোখ ফেটে যেন অশ্রু বেরিয়ে আসতে চায়। প্রতিনিয়ত নামাজের মতো মহান আমল থেকে দূরে সরে যাচ্ছি আমরা। আমরা আমাদের মুসলমান বলে দাবি করি অথচ নামাজ হলো মুসলমানদের প্রতীক। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমান ও কাফেরের মাঝে পার্থক্যের মাপকাঠি নির্ধারণ করেছেন নামাজকে। নামাজের মাধ্যমে নির্ণিত হয় কে মুসলমান আর কে কাফের। আজ মুসলমান ঈমান ও কুফরের পার্থক্যের সে রেখা মুছে দিচ্ছে। তাহলে উম্মাহর ভাগ্য কীভাবে পরিবর্তন হবে? কে পরিবর্তন করবে উম্মাহর নিপীড়িত ভাগ্য? যদি এভাবেই চলতে থাকে তাহলে মুসলিম উম্মাহর আকাশ থেকে দূরীভূত হবে না বিপদের ঘনঘটা। যারা দুনিয়াকে নামাজের ওপর প্রাধান্য দেয় তাদের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা প্রস্তুত করে রেখেছেন সীমাহীন লাঞ্ছনা।

যারা দুনিয়াকে আল্লাহর আনুগত্যের ওপর অগ্রগণ্য করে। কোনোদিন তাদের ভাগ্য পরিবর্তন হবে না। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন,

---

২৪ সুরা আরাফ: ১৭৯

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'যখন তোমাদের ওপর একটি বিপর্যয় এলো; যার দ্বিগুণ বিপর্যয় ইতিপূর্বে তোমরা তোমাদের প্রতিপক্ষের জন্য ঘটিয়েছিলে, তখন তোমরা বললে, এটা কোথা থেকে এলো? হে নবী আপনি বলে দিন, এটা তোমাদের নিজেদের কৃতকর্মের ফল। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।'[২৫]

উম্মাহর আজ বিপর্যয়ের প্রধান কারণ, তারা নামাজ পড়ে না। তারা তাদের নামাজের প্রতি প্রচণ্ড উদাসীন। আর এর মাধ্যমেই তাদের ঈমানের পরীক্ষাও হয়ে যায়। ঈমান তো নিছক মৌখিক স্বীকারোক্তির নাম নয়। ঈমান যেমন মৌখিক স্বীকারোক্তির নাম, তেমনি আমলে পরিণত করারও নাম। আর নামাজ হলো সর্বোত্তম ইবাদত। মুসলমান আজ নামাজকে পেছনে ফেলে দিনরাত মত্ত থাকে দুনিয়ার অন্বেষণে। সম্পদ আর টাকার নেশা তাদেরকে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা বেমালুম ভুলিয়ে দিয়েছে। জীবনের করণীয় সম্পর্কে তারা চূড়ান্ত বেখবর হয়ে পড়েছে।

---

২৫ সুরা আলে ইমরান: ১৬৫

সালাফদের সতর্কতা

আমরা দিন ও রাতকে যে অর্থে গ্রহণ করেছি এবং যেভাবে এর খসরা সাজিয়েছি, পূর্ববর্তী মনীষীদের নিকট রাত ও দিনের অর্থ ছিল ভিন্ন। আমরা রাতকে নিছক ঘুম আর দিনকে বানিয়েছি পার্থিব সঞ্চয়ের মাধ্যম। আমাদের জীবন যেন একটি ছকবাঁধা নিয়মে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। যার একমাত্র আয়োজন হলো দুনিয়া, দুনিয়া এবং দুনিয়া। কিন্তু আমাদের পূর্ববর্তী মনীষীদের জীবন ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত উমর ইবনে আবদুল আযিয রহ. বলেন, রাত ও দিন তোমাদের জন্য কাজ করে, সুতরাং তোমরাও রাত-দিনের কাজ করো। রাত-দিনের কতিপয় হক রয়েছে সেগুলো যথাযথ আদায় করো।

হযরত আবু বকর রা. একদা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-কে বললেন, রাত-দিনের কতিপয় হক রয়েছে। দিনের হক আদায় করার দ্বারা রাতের হক আদায় হবে না। তেমনিভাবে রাতের হক আদায় করার দ্বারা দিনের হক আদায় হবে না।'

হযরত আবু জর রা. ছিলেন দুনিয়াবিমুখ সাহাবি। দুনিয়ার প্রতি তার ছিল না ন্যূনতম আকর্ষণ। লোকালয় ছেড়ে তিনি এক নির্জন উপত্যকায় বসবাস করতেন। অনেকদিন পর তিনি একদিন মক্কায় আগমন করেন। এসে দেখেন মক্কার লোকজন বসবাসের জন্য বিশাল বিশাল পাকা গৃহ নির্মাণ করছে। খাদ্য-পানীয়ের প্রতি তাদের লালসা পূর্বের চেয়ে ঢের বৃদ্ধি পেয়েছে। এ দেখে তিনি ভারি আশ্চর্য হলেন। হৃদয়ে তার নিদারুণ বেদনা জাগ্রত হলো। তাদের পরিণতির কথা ভেবে তিনি প্রচণ্ড আহত হলেন। মনের এ কষ্ট তিনি লুকিয়ে রাখতে পারেননি। মক্কার লোকদের ডেকে উচ্চৈস্বরে ও তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বলেন, 'হে মক্কাবাসী! আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি। আর আমি তোমাদের প্রতি দয়ালু ও বিশ্বস্ত। তোমরা আমার কথা হৃদয়ের কান দিয়ে শ্রবণ করো। দুনিয়াতে কেউ যদি কোথাও সফরে বের হয় তাহলে সফরের যতটুকু পাথেয় দরকার কেবল ততটুকু সঙ্গে বহন করে। এর বেশি যে নেয় সে বোকা। কেননা, কোনো বুদ্ধিমান কখনো অযথা বোঝা বহনের কষ্টে নিজেকে পতিত করে না। জেনে রেখো! এ দুনিয়াতে তোমরা সকলেই মুসাফির। তোমাদের এ সফরের পরিসমাপ্তি ঘটবে মৃত্যুর মাধ্যমে। আখেরাত হবে চিরস্থায়ী বাসস্থান। ক্ষণকাল দুনিয়াতে তোমরা বসবাস করবে। তারপর

ফিরে যেতে হবে চিরস্থায়ী গন্তব্য আখেরাতে। সুতরাং দুনিয়াতে থাকার জন্য যে পরিমাণ পাথেয় প্রয়োজন কেবল সে পরিমাণই গ্রহণ করো। এর বেশি তোমরা গ্রহণ করো না। আখেরাতের অনন্ত জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করো। যার শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই।

হযরত আবু জর রা.-এর কথা শুনে মক্কার লোকেরা বলল, আখেরাতের পাথেয় কী যা আমরা দুনিয়া থেকে আখেরাতে প্রেরণ করব?
হযরত আবু জর রা. বললেন, তোমরা অন্ধকার কবরের পাথেয় হলো রাতের অন্ধকারে নামাজ আদায় করা। বেশি বেশি হজ করো। কাবাগৃহের তাওয়াফ করো। হে মক্কাবাসী! তোমরা তোমাদের জীবনকে দুটি ভাগে ভাগ করো। এক ভাগ হবে আখেরাতের জন্য। আখেরাতের জন্য ততটুকুই করো যতটুকু প্রয়োজন। আরেক ভাগ দুনিয়ার জন্য। দুনিয়ার জন্য ততটুকু করো যতটুকু প্রয়োজন; এর বেশি নয়। তেমনিভাবে তোমাদের সম্পদকে দুটি ভাগে ভাগ করো। এক ভাগ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করো এবং আরেক ভাগ খরচ করো তোমাদের পরিবার পরিজনের জন্য। দুর্ভাগ্য তোমাদের জন্য, তোমরা কেন বসবাসের জন্য বিশাল এ উঁচু উঁচু গৃহ নির্মাণ করছ; অথচ এখানে তোমরা চিরদিন বসবাস করতে পারবে না। তোমরা কেন অগুনতি সম্পদ জমা করছ; যা তোমরা নিজেরা খেতে পারবে না। আমি দেখতে পাচ্ছি, দুনিয়ার প্রতি তোমাদের লোভ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পার্থিব জীবনের ধন-সম্পদের প্রতি তোমাদের আশা দীর্ঘায়ত হচ্ছে।'

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আজ কী হতো যদি আবু জর রা. আমাদের কাছে আসতেন? আজ কী হতো যদি আবু জর রা. এসে আমাদেরকে বিশাল বিশাল আকাশছোঁয়া দালান-অট্টালিকা নির্মাণ করতে দেখতেন? আজ কী হতো যদি আবু জর রা. আমাদের কাছে এসে দেখতেন, আমরা অজস্র টাকা ব্যাংকে জমা করছি? আজ কী হতো যদি আবু জর রা. আমাদের নিকট এসে দেখতেন, আমাদের স্ত্রী-সন্তানগণ অশ্লীলতা আর গানবাদ্যে আকণ্ঠ ডুবে আছে? আজ কী হতো যদি আবু জর রা. এসে দেখতেন, যুবকরা নাইটক্লাব আর খেলার স্টেডিয়ামে পড়ে আছে? আজ কী হতো যদি আবু জর রা. এসে দেখতেন, মদের বারগুলো জীবন্ত আর মসজিদগুলো পড়ে আছে বিরান হয়ে? আজ কী হতো? আজ কী হতো যদি আবু জর রা. এসে আমাদের দেখতেন? আল্লাহর কসম! আজ কী হতো আমি জানি না।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আজ পৃথিবীব্যাপী মুসলমানরা নির্যাতিত। দেশে দেশে মুসলমানরা আজ লাঞ্ছিত। নিপীড়িত। কেন আজ মুসলমানদের এ করুণ পরিণতি? আমাদের এমন পরিণতির কারণ কী? এর কারণ হলো, আমরা আমাদের ঈমানের প্রতি গাফেল হয়ে আছি। আল্লাহর আনুগত্য থেকে আমরা বহু দূরে সরে আছি। পৃথিবীতে নিজেদের করণীয় সম্পর্কে গাফেল হয়ে আছি। আমরা আমাদের কর্তব্যের প্রতি সীমাহীন বেখবর। জেনে রেখো! আমাদের পূর্বে আরো বহু শক্তিশালী জনগোষ্ঠী পৃথিবীতে আগমন করেছিল। তাদের শক্তি-সামর্থ্য ও ধন-সম্পদ আমাদের চেয়ে অনেক অনেক বেশি ছিল। কিন্তু তাদের কেউ পৃথিবীতে থাকতে পারেনি। বিশাল এ পৃথিবীতে আজ তাদের কেউ নেই। সবাইকে চলে যেতে হয়েছে কবরে। সবাইকে আস্বাদন করতে হয়েছে মৃত্যুর স্বাদ।

জেনে রেখো! ছোট-বড়, ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ সকলকে মৃত্যুর স্বাদ পেতে হবে। সকলকে যেতে হবে ঐ অন্ধকার কবরগৃহে। অতঃপর সকলের নিকট আগমন করবে ফেরেশতা। এসে জিজ্ঞেস করবে তিনটি মহা প্রশ্ন।

তোমার রব কে?
তোমার ধর্ম কী?
তোমার নবী কে?

আল্লাহর কসম! এ প্রশ্নের সম্মুখীন সকলকেই হতে হবে। কেউ এর ব্যতিক্রম হবে না। চাই সে যতই ক্ষমতাবান হোক না কেন। দুনিয়াতে তার সম্পদের যত বড় পাহাড় থাকুন না কেন।

ভেবো না এ কথা যে, এগুলো তো ভারি সহজ প্রশ্ন। বেশ মামুলি কথাবার্তা। নিমিষেই উত্তর দিয়ে দেব। ঐ সত্তার কসম যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান-জমিন, সৃষ্টি করেছেন সমস্ত নিখিল, দুনিয়াতে যারা গাফেল তারা কিছুতেই তিন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না। তাদের কাছে সেদিন অত্যন্ত কঠিন ও ভারী মনে হবে। তাদের যখন কবরে রাখা হবে তখনই তারা ভুলে যাবে সবকিছু। প্রচণ্ড ভয়ে তাদের মুখ থেকে কোনো কথাই বের হবে না তখন। একমাত্র ব্যতিক্রম হবে তারা যারা দুনিয়ায় আল্লাহর আনুগত্য করেছে। মহা তিন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে কেবল আল্লাহর সেসব প্রিয় বান্দাগণ যাদের অন্তর ছিল সদা জাগ্রত। যারা দুনিয়াতে ছিল পরকালের প্রতি সতর্ক। দুনিয়ার গাফলত যাদের কখনো স্পর্শ করেনি।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন,

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ

'আল্লাহ সুদৃঢ় কথা দ্বারা মুমিনদের পার্থিব জীবন ও পরকালে অটল ও অবিচল রাখেন। আল্লাহ জালেমদের বিপথগামী করেন। আল্লাহ যা চান তাই করে থাকেন।' [২৬]

উদাসীনতা মানুষকে সঠিক পথ থেকে বিরত রাখে

গাফলত তথা উদাসীনতা মানুষকে ইসলামের সরল-সঠিক পথ থেকে বিরত রাখে। গাফেল ব্যক্তি দুনিয়া-আখেরাতের চিরস্থায়ী সফলতা থেকে বঞ্চিত হয়। কুরআন-হাদিসের শাশ্বত কল্যাণ থেকে বহু দূরে অবস্থান করে। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন,

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ

যারা অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে দাম্ভিক আচরণ করে আমি তাদের আমার নিদর্শনসমূহ থেকে ফিরিয়ে রাখব। তারা প্রতিটি নিদর্শন দেখলেও তা বিশ্বাস করে না। তারা সৎপথ দেখলেও তাকে পথ হিসেবে গ্রহণ করে না। কিন্তু ভ্রান্ত পথ দেখলেই

---

২৬ সুরা ইবরাহিম: ২৭

তাকে পথ হিসেবে গ্রহণ করে। এটা এজন্য যে, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলেছে এবং সে সম্বন্ধে তারা গাফেল ও অমনোযোগী।'[২৭]

হে আল্লাহর বান্দাগণ! পরকালের জন্য কী পাথেয় গ্রহণ করেছ? কবরের অন্ধকার গৃহের জন্য তোমার প্রস্তুতি কী? কবরের সেই তিন প্রশ্নে জবাব কি তুমি দিতে পারবে? আল্লাহ তায়ালা যখন তোমার প্রতি ওয়াক্ত নামাজের হিসাব চাইবেন তখন তোমার উত্তর কী হবে? কী বলবে সেদিন রাজাধিরাজ মহাশক্তিধর আল্লাহকে?

জেনে রেখো! আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে তোমার প্রতিটি কর্মের যথোচিত হিসাব চাইবেন। পার্থিব জীবনে তোমার মুখ থেকে নির্গত প্রতিটি শব্দ ও বাক্যের হিসাব সেদিন দিতে হবে। ছোট বড় কোনো আমলই আল্লাহর নিকট অজানা নয়। সেদিন কেউ এক পা অগ্রসর হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার প্রতিটি কথা ও আমলের হিসাব দেবে।

একদা হযরত হাসান আল বসরি রহ. পথ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। রাস্তার পাশে অনেকগুলো তরুণ দাড়িয়ে খোশগল্প করছে। তাদের মধ্যে একজন এমন অট্টহাসি দিলো যে, তার হাসিতে চারপাশ কলরিত হয়ে উঠল। হযরত হাসান বসরি রহ. ডাকলেন তাকে। জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এভাবে হাসছ কেন? তুমি কি পুলসিরাত অতিক্রম করে ফেলেছ?

যুবক জবাব দিলো, না।
হাসানা বসরি রহ. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জানো পুলসিরাত যে অতিক্রম করতে পারবে সে জান্নাতে যাবে, আর যে তা অতিক্রম করতে পারবে না সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে?
যুবক পুনরায় জবাব দিলো, না।

অতঃপর হযরত হাসান বসরি রহ. যুবককে বললেন, তাহলে তুমি উন্মাদের মতো এভাবে হাসছ কেন? তোমার চূড়ান্ত সফলতা তো এখনো নির্ধারণ হয়নি। তবুও তুমি হাসছ এভাবে? কোন জিনিস তোমাকে আখেরাত সম্পর্কে উদাসীন করে রেখেছে যার ফলে এমনভাবে হাসছ তুমি?

---

২৭ সুরা আরাফ: ১৪৬

হে আল্লাহর বান্দাগণ! এর কারণ হলো গাফলত। আর কত? আর কত গাফলতের চাদরে মুড়িয়ে থাকবে? উদাসীনতার উপত্যকায় আর কতদিন উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরতে থাকবে? তুমি কি দেখো না, প্রতিনিয়ত আমাদের মধ্য থেকে কেউ না কেউ মৃত্যুবরণ করছে? চলে যাচ্ছে জীবনের সকল পাঠ চুকিয়ে। সকল স্বপ্ন সকল আশা তার পেছনে পড়ে থাকে তখন। আমরা নিজহাতে তাদের কাফন-দাফন দিই। তাদের রেখে আসি একাকী অন্ধকার নির্জন কবরগৃহে। তবুও কেন আমাদের বোধ জাগ্রত হয় না? আমাদের জীবন থেকে গাফলতি দূর হয় না? জীবনের সকাল-সন্ধ্যাগুলো কেটে যাচ্ছে একে একে। হারিয়ে যাচ্ছে জীবনের একের-পর-এক বসন্ত। তবুও আমরা ফিরে আসছি না আমাদের রবের দিকে।

কতিপয় হৃদয়বিদারক ঘটনা

বিস্ময়জাগানিয়া ও হৃদয়বিদারক কিছু ঘটনা আমি আপনাদের নিকট বর্ণনা করব যা আমাদের অন্তরকে ভীষণভাবে নাড়িয়ে দেবে। শিহরিত করবে আমাদের শরীর ও সত্তাকে। আমাদের জাগ্রত করবে উদাসীনতার ঘুম থেকে। এসব ঘটনা বলার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শিক্ষাগ্রহণ করা। নিছক আনন্দ ও বিস্মিত হওয়ার জন্য নয়। ঘটনাগুলো মাধ্যমে গাফেল ব্যক্তিদের করুণ পরিণতি এবং সৎ ব্যক্তিদের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে ধারণা অর্জিত হবে। এর মাধ্যমে আমাদের আগামী দিনের করণীয় ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে অধিকতর সহজ হবে। সে আলোকে জীবন পরিচালনা করে উভয় জগতে সফলতা অর্জন করতে পারব ইনশাআল্লাহ।

মৃত্যুর সময় ভুলে গেছে কালিমা

মহাসড়কে ট্রাফিক পুলিশের কাজ করেন এমন এক ব্যক্তি আমাকে কষ্টদায়ক ও হৃদয়বিদারক একটি ঘটনা শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, একদিন রাস্তায় দুটি গাড়ি পরস্পরে প্রতিযোগিতা করছিল। তাদের প্রতিযোগিতা হলো, কে আগে গন্তব্যে পৌঁছতে পারে তা পরীক্ষা করা। নিজেদের সাহসিকতা ও শক্তিমত্তা জাহির করতে তারা উভয়ে প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে। ফলে তারা তাদের গাড়ির গতি অসম্ভব বাড়িয়ে দিয়েছিল। আর তখনই ঘটে হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনাটি। উভয় গাড়ি একটা আরেকটার সাথে সংঘর্ষ হয়। চোখের পলকে ঘটে যায় মারাত্মক এক্সিডেন্ট। সড়কে নিয়োজিত নিরাপত্তাকর্মীরা তাদের উদ্ধারের জন্য দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। আমিও ছিলাম তাদের মাঝে।

প্রথম গাড়িটির ভেতরে গিয়ে দেখি সেখানে কেউ বেঁচে নেই। সকলে মারা গেছে। রক্তাক্ত হয়ে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে আছে তাদের শরীর। সেখানে সময় অতিবাহিত না করে আমরা দ্রুত দ্বিতীয় গাড়িতে যাই। আমরা চাচ্ছিলাম, জীবিত কেউ থাকলে তাদের আগে উদ্ধার করা। দ্বিতীয় গাড়িতে প্রবেশ করে দেখি, এখানে তিনজন তরুণ বেঁচে আছে। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে অবিরাম রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। তাদের জীবন ছিল কণ্ঠাগত। হয়তো খানিক বাদে তারাও মারা যাবে। আমরা দ্রুত তাদের গাড়ির ভেতর থেকে বাহিরে বের করে আনি এবং রাস্তার পাশে শুয়ে দিই। তাদের অবস্থা এতই শোচনীয় ছিল যে, আমরা বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়েছি। তাই মৃত্যুর পূর্বে আমরা তাদের কালিমা পড়ানোর চেষ্টা করি। আমরা বারবার তাদের কানের কাছে কালিমা পড়ছিলাম; যেন তারা মৃত্যুর পূর্বে কালিমা পড়তে পারে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, তাদের মুখ দিয়ে তখন কালিমার পরিবর্তে গান বেরিয়ে আসছিল। আমরা বারংবার চেষ্টা করে যাচ্ছি। প্রতিবারই তাদের মুখ থেকে গানের কথা বেরিয়ে আসে। তাদের এমন করুণ পরিণতি দেখে আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাই। তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা ভেবে আমাদের মুখ থেকে দিয়ে কোনো কথা পর্যন্ত বের হচ্ছিল না। অবশেষে তাদের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তাদের কারো কালিমা পড়ার সৌভাগ্য হয়নি। জানি না আল্লাহ তাদের সাথে কেমন আচরণ করেছেন। স্বচক্ষে দেখা এ ঘটনা উপস্থিত আমাদের জীবনকে পরিবর্তন করে দিয়েছে। আর কেই-বা আছে এমন যে, এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে না।

হে যুবক! তাদের এমন দুর্ভাগ্য পরিণতির কারণ কী? এর কারণ তো এই যে, তারা জীবনভর পাপাচারে লিপ্ত ছিল। পার্থিব জীবনে তাদের সঙ্গী ছিল গানবাদ্য ও অশ্লীলতা। তারা কখনো কুরআন পড়েনি। মসজিদে যায়নি। নামাজ পড়েনি। আল্লাহর আনুগত্য করেনি। তাকে ভয় করেনি। যদি তাদের অন্তরে তাকওয়া থাকত, যদি তারা গাফেল না হতো তাহলে মৃত্যুর পূর্বে তাদের মুখ থেকে কালিমা বের হতো। অন্তিম সময়ে তাদের মুখ থেকে গান বেরিয়ে আসত না। জীবনভর তারা যে কর্ম করেছে তার ওপরই তাদের মৃত্যু হয়েছে। হে মুসলিম যুব ও তরুণ প্রজন্ম! এর থেকে শিক্ষাগ্রহণ করো। সমস্ত উদাসীনতা পরিহার করে, আল্লাহর অবাধ্যতা ও নাফরমানি পরিত্যাগ করে ফিরে এসো রবের দিকে। তোমাদের হৃদয়ে তাকওয়া অর্জন করো। নামাজের প্রতি যত্নবান হও। মসজিদকে তোমাদের সঙ্গী বানাও। নামাজকে বানাও পরম বন্ধু। হে যুবক! উপর্যুক্ত ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তোমাদের পরবর্তী জীবন সাজাও।

মৃত ব্যক্তিদের গোসল দেন এমন এক ব্যক্তি একটি করুণ কাহিনি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন। এক যুবক। দেখতে ছিল ভারি সুদর্শন। দেহ-গঠনে ছিল পরিপূর্ণ ও দারুণ সৌন্দর্যমণ্ডিত। একদিন আকস্মিক সে মৃত্যুবরণ করে। না তার কোনো অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণ ছিল না। তাকে গোসল দেওয়ার জন্য যথারীতি আমাকে ডাকা হলো। আমি যখন গোসল দেওয়ার জন্য তার মুখমণ্ডল খুলেছি, দেখি—তার সুন্দর চেহারা খুবই ভয়ংকর ও কুৎসিত আকৃতি ধারণ করেছে। আমি তার চেহারা দেখে ভয় পেয়ে যাই। অনেক মৃতকেই আমি গোসল দিয়েছি কিন্তু এমন কখনো দেখিনি। আল্লাহ তায়ালা সত্যই বলেছেন,

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

'ফেরেশতারা যখন কাফেরদের জান কবজ করে তখন তুমি যদি দেখতে, তারা তাদের মুখে ও পাছায় আঘাত করে আর বলে, জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করো। এটি তোমাদের কৃতকর্মের ফল। আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না।'[২৮]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুম করেননি, বরং তারাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছে।'[২৯]

২৮ সুরা আনফাল: ৫০-৫১
২৯ সুরা আলে ইমরান: ১১৭

লোকটি বলেন, এ দেখে আমি এতই আতঙ্কিত হয়ে পড়ি যে, দ্রুত গোসলখানা থেকে বেরিয়ে আসি। বাহিরে তখন যুবকের পিতা দাঁড়ানো ছিল। আমি যুবকের পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম দুনিয়াতে তার কর্ম সম্পর্কে। তিনি আমাকে অবহিত করলেন, 'আমার ছেলে কখনো নামাজ পড়ত না। আল্লাহ বিধি-বিধান পালনের প্রতি ছিল পূর্ণ গাফেল ও উদাসীন।'

হে যুবক! শোনো তোমাদের মতোই এক যুবকের পরিণতির কথা। মৃত্যুর পর কোন ভয়ংকর পরিণতি তাকে গ্রাস করেছে। দুনিয়াতেই তার আজাব শুরু হয়ে যায়। তার চেহারা বিকৃতি হয়ে যায়। লোকে তাকে দেখে ভয়ে ছিটকে পড়ে। এর কারণ তো আর কিছু নয়। এর কারণ হলো, যুবকটি ছিল গাফেল। আমলের প্রতি ছিল তার চরম উদাসীনতা। আল্লাহর আনুগত্য করত না। তাকে ভয় করত না। নামাজ পড়ত না।
আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

> أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

> 'আল্লাহর স্মরণ ও তার অবতীর্ণ সত্যের কল্যাণে মুমিনদের জন্য কি সময় হয়নি যে, তাদের অন্তর বিনম্র হবে এবং তারা তাদের মতো হবে না যাদের ইতিপূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল? অতঃপর বহুকাল অতিক্রান্ত হওয়ায় তাদের অন্তর শক্ত হয়ে গিয়েছে। তাদের অনেকেই অবাধ্য। জেনে রেখো! আল্লাহ জমিনকে মৃত্যুর পর জীবিত করেন। আমি তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো।'[৩০]

---

৩০ সুরা হাদিদ: ১৬-১৭

মৃত্যুর সময় কুরআন পড়ছিল এক যুবক

জনৈক ব্যক্তি একটি অতি আশ্চর্য ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এক পরিণত যুবক রাস্তায় গাড়ি চালাচ্ছিল। চলতে চলতে হঠাৎ পথে তার গাড়িটি নষ্ট হয়ে যায়। যুবকটি গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার পাশে তার গাড়িটি মেরামত করছিল। এমন সময় পেছন থেকে অন্য একটি গাড়ি এসে যুবককে সজোরে ধাক্কা দেয়। অমনি সাথে সাথে যুবকটি রাস্তার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। তার পুরো শরীর থেতলে যায়। রক্তে ভেসে যায় চারপাশ। গাড়িটি তাকে আহত ও রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে দ্রুত পালিয়ে যায়। আমরা যারা পথিক ছিলাম দৌড়ে যুবকের নিকট গেলাম। তখনো সে বেঁচে ছিল। আমরা তাকে হাসপাতাল নেওয়ার জন্য একটি গাড়িতে ওঠালাম।

গাড়ি হাসপাতালের দিকে যাচ্ছে। আমাদের সকলকে দারুণ বিস্মিত করে যুবকটি হঠাৎ আহত ও রক্তাক্ত অবস্থায় অত্যন্ত মধুর সুরে কুরআন তিলাওয়াত করতে শুরু করে। বিষয়টি আমাদের ভীষণ রকমের আশ্চর্যান্বিত করে। আমরা উপস্থিত সকলে বিস্মিত হয়ে চোখ বড় বড় করে যুবকের দিকে তাকিয়ে থাকি। যুবকটি তখন আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে ছিল। হাসপাতাল তখনো আর অনেক পথ বাকি। আমরা তাকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকি। কিন্তু জীবন ও মৃত্যু একমাত্র তারই হাতে যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। ধীরে ধীরে তার কণ্ঠ স্তিমিত হয়ে আসে। আমরা তাকে কালিমা পড়ানোর আগেই সে কালিমা পড়ে। কিছুক্ষণ পর তার হাত দুটো নিস্তেজ হয়ে আমার ওপর পড়ে যায়। কালিমা পড়তে পড়তে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

আল্লাহু আকবার! কী সৌভাগ্যের মৃত্যু এ যুবকের। কতই-না সুন্দর মৃত্যু হয়েছে তার। মৃত্যুর পূর্বে কুরআন তিলাওয়াত করেছে। বারবার কালিমা পড়েছে। হে আল্লার বান্দা! মৃত্যুর পূর্বে কালিমা কেবল তারাই পড়তে পারে যারা আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার সৌভাগ্যবান বান্দা। যাদের আল্লাহ তায়ালা নির্বাচন করেছেন তার প্রিয় বান্দা হিসেবে। এ মৃত্যু যুবকের সুন্দর জীবনযাপনের প্রমাণ। জীবনভর সে আল্লাহর আনুগত্য করেছে। নামাজ পড়েছে। দুনিয়ার মোহে আখেরাতকে সে ভুলে যায়নি কখনো। হে মুসলিম

যুবক! শিক্ষাগ্রহণ করো। এক যুবককে মৃত্যুর সময় কত চেষ্টা করেও কালিমা পড়ানো যায়নি। এক যুবককে চেষ্টা ছাড়াই কুরআন তিলাওয়াত এবং কালিমা পড়তে শুরু করেছে। এর পেছনে আসল রহস্য কী? হে যুবক! চিন্তা করো। ভেবে দেখো। উপদেশ গ্রহণ করো। এর মাধ্যমে তোমাদের আগামীর কর্মপন্থা নির্ধারণ করো।

যুবকের সৌভাগ্যের মৃত্যু

মৃত ব্যক্তিদের গোসল দেন এমন ব্যক্তি একটি অতি আশ্চর্যজনক ঘটনা বলেছেন। তিনি বলেন, এক যুবককে মৃত্যুর পর গোসল দেওয়ার জন্য আমাকে ডাকা হলো। তাকে গোসল দেওয়ার জন্য আমি ভেতরে প্রবেশ করি। তখন আমার সাথে ছিল আরো একজন। আমরা যখন যুবককে গোসল দিচ্ছি তখন চারদিক সুগন্ধে মোহিত হয়ে যায়। এমন সুগন্ধ আমি কখনো পাইনি জীবনে।

লোকটি বলেন, আমি আমার সহকারীকে বললাম, তুমি কি সুঘ্রাণ পাচ্ছ? সে বলল, হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, আমি কখনো এমন সুঘ্রাণের সাথে ইতিপূর্বে পরিচিত ছিলাম না। আর তার মুখমণ্ডল অতি উজ্জ্বলতায় ফকফক করছিল। দীর্ঘদিন কত মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিয়েছি কিন্তু এমন সুন্দর চেহারা আমি কোনো মৃত ব্যক্তির দেখিনি। আমি অত্যন্ত আগ্রহ উদ্দীপনার সাথে যুবককে গোসল দিতে থাকি। পরবর্তীতে আমি জেনেছি, যুবকটি ছিল অত্যন্ত সৎ ও পরহেজগার। আল্লাহর আনুগত্য করত। সৎকাজের আদেশ করত, অসৎকাজ থেকে লোকদের বিরত রাখত। তার জীবন ছিল সততা ও উত্তম আদর্শে মোড়ানো। আমরা তাকে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে জানাজা শেষে কবরস্থানে নিয়ে গেলাম।

যারা তাকে কবরে নামিয়েছে তাদের মাঝে আমিও ছিলাম। আল্লাহর কসম! কবরে রাখার পর তার লাশ কেমন নড়ে উঠল। আমি আশ্চর্য হয়ে আমার সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলাম, তারাও এমনটি অনুভব করল। তার চেহারা আপনা থেকেই কেবলামুখি হয়ে গেল। আমি আশ্চর্য হয়ে তার মুখমণ্ডলের দিকে তাকালাম। দেখি, সে হাসছে। অতি উজ্জ্বল তার চেহারার রঙ। যেন

পূর্ণিমার চাঁদ নেমে এসেছে কবরে। আমি সন্দেহ পোষণ করলাম, সত্যিই সে মৃত্যুবরণ করেছে কি না। কিন্তু পরক্ষণেই আমার সন্দেহ দূর হয়ে গেল। কারণ, আমিই তো তাকে গোসল দিয়েছি। এবং আমি জানি সে ছিল একজন আদর্শবান যুবক। কখনো আল্লাহর অবাধ্যতা করেনি। আমরা যুবককে কবরস্থ করে ফিরে এলাম।

তরুণ প্রজন্মের হৃদয়ে ঈমানের পরিচর্যা

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন,

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ

'তারা ছিল কয়েকজন যুবক; যারা তাদের প্রভুর প্রতি ঈমান এনেছিল।'[৩১]

কারা ছিল সে-সমস্ত যুবক যারা তাদের প্রভুর প্রতি ঈমান এনেছিল? কারা ছিল তারা, যাদের কথা আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে আলোচনা করেছেন? আর এর পেছনে কী ছিল সে কারণ? কেন তারা তাদের পরিবার-পরিজন ছেড়ে চলে গিয়েছিল? কেন তারা ছেড়ে চলে গিয়েছিল নিজেদের সম্প্রদায়? কেন তারা মাতৃভূমি ত্যাগ করে হিজরত করেছিল দূর পাহাড়ে? কেন তারা দুনিয়ার মোহ-মায়া পরিত্যাগ করেছিল? কেন তারা নিজেদের জীবনকে তুচ্ছ করে গৃহ ও পরিবারহীন হয়েছিল?

হে মুসলিম যুব ও তরুণ প্রজন্ম! শোনো হৃদয়ের দুয়ার উন্মোচন করে। শোনো অন্তর্চক্ষু দিয়ে তাদের বর্ণনা। সে-সমস্ত যুবকরা ছিল তাদের আনীত ঈমানের ওপর অত্যন্ত সুদৃঢ়। তাদের অন্তরে ঈমান এতই বদ্ধমূল ছিল যে, তারা ঈমানের জন্য পৃথিবীর সকল কিছু বিসর্জন দিতে মোটেও কুণ্ঠিত হয়নি। তাদের ঈমান ছিল এতই মজবুত যে, ঈমানের সামনে দুনিয়ার কোনো বস্তুই টিকতে পারেনি। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার প্রতি তাদের বিশ্বাস ছিল অগাধ। পূর্ণ আস্থা ও ইয়াকিনের ওপর তারা ছিল অটুট। তাদের সামনে দুটি সুযোগ ছিল। হয়তো তারা আল্লাহর প্রতি আনীত ঈমান পরিত্যাগ করবে অথবা বিসর্জন দেবে জীবনের প্রতি ভালোবাসা। পালিয়ে যাবে পরিবার-পরিজন ও মাতৃভূমির ভালোবাসা ত্যাগ করে। আল্লাহু আকবার! তারা দ্বিতীয়টিই বেছে নিল। দুনিয়ার ওপর আখেরাতকে প্রাধান্য দিলো। মূর্তিপূজার ওপর আল্লাহর একনিষ্ঠ আনুগত্যকে প্রাধান্য দিলো। কুফরির ওপর ঈমানকে অগ্রগামী করল। ঈমানের প্রশ্নে তারা ছিল সুদৃঢ় ও

---

৩১ সুরা কাহফ: ১৩

অটুট। দুনিয়ার সুশোভিত সৌন্দর্য, জীবনের মায়া, পরিবার-পরিজনের ভালোবাসাকে ঈমানের জন্য কুরবানি করল। রাতের অন্ধকারে তারা দেশ ছেড়ে চলে গেছে কোনো এক অজানার উদ্দেশ্যে। তারা জানে না কোথায় যাবে। কিন্তু তারা এতটুকু জানে যে, তাদের ঈমান বাঁচাতে হবে। ঈমান বাঁচানোর জন্য সবকিছু পরিত্যাগ করে তারা বেরিয়ে পড়ল।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাদের প্রশংসা করে বলেন,

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ

'তারা ছিল কয়েকজন যুবক; যারা তাদের প্রভুর প্রতি ঈমান এনেছিল।' [৩২]

হে মুসলিম তরুণ প্রজন্ম! ঈমান এক মূল্যবান জিনিস। দুনিয়া ও আখেরাতে ঈমানের চেয়ে মূল্যবান কোনো বস্তু নেই। ঈমান মানুষকে নবজীবন দান করে। নতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত করে।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন,

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ

'যে ব্যক্তি মৃত ছিল, তারপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং একটি আলো দান করেছি যার সাহায্যে সে মানুষের মধ্যে চলতে পারে, সে কি ওই ব্যক্তির মতো হতে পারে যে অন্ধকারের মধ্যে আছে?'[৩৩]

ঈমান এমন এক জিনিস যা মানুষকে লাঞ্ছনার পর দান করে সম্মান। অপদস্থতার পর দান করে মর্যাদা। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

'শত্রুর সামনে তোমরা দুর্বল কিংবা বিষণ্ণ হয়ো না। ঈমানদার হলে তোমরাই বিজয়ী হবে।' [৩৪]

---

৩২ সুরা কাহফ: ১৩

৩৩ সুরা আনআম: ১২২

৩৪ সুরা আলে ইমরান: ১৩৯

ঈমান এমন এক জিনিস যা বান্দার হৃদয়ে শঙ্কা ও ভয়ের পর দান করে সাহসিকতা। ব্যর্থতার পর দান করে সফলতা। পরাজয়ের পর দান করে বিজয়। দুর্বল ঈমান ও ভীত ব্যক্তিকে করে অধিকতর সাহসী।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন,

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

'লোকেরা যাদের বলেছিল, শত্রুপক্ষের মানুষেরা তোমাদের মোকাবেলার জন্য সৈন্য সমাবেশ করেছে। অতএব তাদের ভয় করো। এ কথায় তাদের ঈমান আরো বেড়ে গিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনিই উত্তম কর্মনির্ধারক।'[৩৫]

ঈমান এমন এক মূল্যবান জিনিস ও পরশপাথর, যা জীবনকে করে স্বার্থক ও আনন্দময়। অন্তরকে করে সুদৃঢ়। হৃদয়কে করে প্রশস্ত ও উদার। ঈমান আনুগত্যে মিষ্টতা এনে দেয়। অবাধ্যতা ও নাফরমানিতে ঘৃণা তৈরি করে। ঈমান মানুষকে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের প্রতি ধাবিত করে। তার ওপর ভরসা করে। ঈমান আল্লাহর সাথে বান্দার অন্তরঙ্গতা ও গভীর সম্পর্ক তৈরি করে। ঈমান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অবারিত রহমতস্বরূপ।

হে মুসলিম তরুণ! ভেবে দেখো আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে আসহাবে কাহফের যুবকদের সম্পর্কে যা বলেছেন সে সম্পর্কে। গভীর অর্থে চিন্তা করো পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে, যেখানে তোমাদের মতোই একদল যুবকের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন আমাদের রব।

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا

'যখন তোমরা তাদের এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছ তখন গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেছ। তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্য তার করুণা

---

৩৫ সুরা আলে ইমরান: ১৭৩

ছড়িয়ে দেবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সহজ করে দেবেন।' [৩৬]

ঈমানের মর্যাদা ও সুফল হলো, আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ঈমানদারদের জন্য সর্বদা সঠিক ও উপযুক্ত পথ তৈরি করে দেন। তাদের অন্তরকে আল্লাহ অত্যন্ত মজবুত ও সুদৃঢ় করে দেন। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন। 'তাদের অন্তরে আমি দৃঢ়তা এনে দিয়েছিলাম যখন তারা দীর্ঘ নিদ্রার পর উঠেছিল এবং বলেছিল, আসমান জমিনের প্রভুই আমাদের প্রভু। আমরা তাকে ছাড়া অন্য কোনো উপাস্যকে ডাকব না। যদি ডাকি তাহলে অবশ্যই আমরা এক অন্যায় কথা বলব।[৩৭]

আল্লাহ তায়ালাকে রব এবং নিজেদের তার বান্দা স্বীকার করার মাঝে রয়েছে প্রকৃত সফলতা। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালাকে যারা একমাত্র ইলাহ হিসেবে বেছে নিয়েছে তাদের জন্যই প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদা। পবিত্র কুরআনে আসহাফে কাহফের যুবকদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন,

إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ

'যখন তারা তাদের দীর্ঘ নিদ্রা থেকে উঠেছিল এবং বলেছিল, আসমান জমিনের প্রভুই আমাদের প্রভু। আমরা তাকে ছাড়া অন্য কোনো উপাস্যকে ডাকব না।' [৩৮]

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্যদের নিজেদের ইলাহ ও উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তারা হয় চূড়ান্ত ব্যর্থ। দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের জন্য নেই কোনো সম্মান ও মর্যাদা। তারা তো মিথ্যে মরীচিকার পেছনে ছুটছে। হ্যাঁ, একদিন তাদের মোহ ভাঙবে। সেদিন তারা আফসোস ও অনুশোচনা করলেও কোনো লাভ হবে না।

---

৩৬ সুরা কাহফ: ১৬

৩৭ সুরা কাহফ: ১৪

৩৮ সুরা কাহফ: ১৪

তাদের সম্পর্কে আসহাবে কাহফের যুবকদের ভাষায় আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً

'এরাই আমাদের স্বজাতি। এরা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করেছে।' [৩৯]

আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াকে বানিয়েছেন পরীক্ষার স্থান। বান্দাকে তিনি নানা বিপদ-আপদ দ্বারা পরীক্ষা করেন। এর মাধ্যমে তিনি তার বান্দার ঈমান যাচাই করেন। তার অন্তরে আল্লাহ ও ঈমানের জন্য কী পরিমাণ ভালোবাসা রয়েছে তা পরখ করেন। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন,

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا * وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا

'পৃথিবীর সবকিছু আমি তার সৌন্দর্যে পরিণত করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করতে পারি, কে তাদের মধ্যে উত্তম আমলকারী। আবার তার সবকিছু আমি শুকনো মাটিতে পরিণত করে দেব।'[৪০]

পূর্বসূরি উলামায়ে কেরামের অনেকেই বলেছেন, আসহাবে কাহফের যুবকরা ছিল সেকালের বাদশাহ, গভর্নর ও মন্ত্রীদের ছেলে। তারা ছিল অত্যন্ত অভিজাত বংশের সন্তান। সামাজিকভাবে তাদের ছিল বিরাট মর্যাদা। কিন্তু এসবের চেয়েও তাদের অন্তরে ঈমান ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী ও মজবুত। তাদের ঈমান এতই সুদৃঢ় ছিল যে, তাদের বাদশাহি স্বভাব, উন্নত জীবন এবং সম্মানজনক সামাজিক মর্যাদা তাদের ঈমানের সামনে টিকতে পারেনি। দুনিয়ার চাকচিক্য ও মোহ তাদের ঈমানের সামনে ছিল অতি তুচ্ছ। ঈমান বাঁচানোর জন্য তারা এমনকি মাতৃভূমি পর্যন্ত ছেড়ে দিলো। কারণ, আশঙ্কা ছিল, তাদের পিতারা, তাদের বংশ-গোত্র তাদের ঈমান থেকে বিচ্যুত করে ফেলবে।

---

৩৯ সুরা কাহফ: ১৫

৪০ সুরা কাহফ: ৭-৮

হে যুবক! আসহাবে কাহফের যুবকরা যদি ঈমানের জন্য সকল কিছু পরিত্যাগ করতে পারে তাহলে আজকের যুবকরা কেন পারবে না? তারা যদি ঈমানের জন্য দুনিয়ার চাকচিক্য ও অশোভন সৌন্দর্য ছেড়ে দিতে পারে তাহলে আজকের যুবকরা কেন তা পারবে না? আমাদের অন্তরে যে ঈমান রয়েছে আসহাবে কাহফের যুবকদের অন্তরেও একই ঈমান ছিল। আমরা যে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি তারাও সে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল। তাদের ঈমান যদি তাদের অন্যায় ও অপকর্ম থেকে বিরত রাখতে পারে তাহলে আমাদের ঈমান কেন আমাদের অন্যায় ও অপকর্ম থেকে বিরত রাখতে পারে না? আসহাবে কাহফের যুবকরা যদি ঈমানের জন্য সকল আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিতে পারে তাহলে হে যুবক! তুমি কেন পারবে না? শিক্ষা গ্রহণ করো তাদের থেকে।

দেখো কেমন ছিল তাদের ঈমান। নিজেদের ঈমানকে তাদের ঈমানের মতো বানাও। তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতে অর্জন করবে অসামান্য মর্যাদা। ঈমান গ্রহণের পূর্বে আসহাবে কাহফের যুবকদের ছিল না কোনো মর্যাদা। আল্লাহ তায়ালার নিকট তাদের জন্য ছিল না কোনো প্রকার সম্মান। কিন্তু ঈমান তাদের নিয়ে গেছে সম্মান ও মর্যাদার সুউচ্চ চূড়ায়। হে যুবক! তোমার ঈমানকেও বানাও তাদের মতো। তাহলে রবের নিকট পাবে তুমিও মর্যাদার সুউচ্চ আসন। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন,

إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ

> 'এই হলো তোমাদের ধর্ম, এক ধর্ম; আর আমি হলাম তোমাদের প্রভু, অতএব তোমরা আমার ইবাদত করো।'[৪১]

আল্লাহ তায়ালাকে সবচেয়ে বিশ্বাস করে তরুণরা। যুবকদের অন্তর ঈমান ও ইয়াকিনের জন্য অধিক উপযুক্ত। তারা সত্যকে দ্রুত চিনতে পারে এবং তাকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে। তারা হেদায়েতের ওপর অটুট থাকে। ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখো, আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকে যারা সাড়া দিয়েছে তাদের অধিকাংশ ছিল যুবক ও তরুণ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যারা ওহির লেখক ছিলেন তারা ছিলেন যুবক। যারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অধিক

---

৪১ সুরা আম্বিয়াঃ ৯২

হাদিস মুখস্থ করেছেন তারা ছিলেন যুবক। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম যাদের বিভিন্ন রাষ্ট্রে দূত হিসেবে প্রেরণ করেছেন তারা ছিলেন যুবক। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যারা কবি ছিলেন তারা ছিলেন যুবক। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডানে ও বামে যারা যুদ্ধ করেছেন তারা ছিলেন যুবক। যুবকদের হাতেই রচিত হয়েছে ইসলামের ইতিহাস। রণাঙ্গনে তারাই উড্ডীন করেছে ইসলামের ঝান্ডা। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করেছে ইসলামের যুব ও তরুণ প্রজন্ম। তারাই উম্মাহর অতন্ত্র প্রহরী। ইসলামের শক্তিশালী সৈনিক।

আজকের মুসলিম যুব ও তরুণ প্রজন্মের অবস্থার পবিরর্তন এবং তাদের করণীয় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ে আলোকপাত করব। যুবকদের চিন্তা চেতনা ও মানস গঠনে যা বিশেষ ভূমিকা রাখবে, ইনশাআল্লাহ।

যুবকদের জ্ঞান অর্জন

আদর্শ মুসলিম যুবকদের অন্যতম গুণ হলো, ইলম তথা জ্ঞান অর্জন করা। ইলম আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার এক বিশাল নিয়ামত। ইলম অর্জনের মাধ্যমে মুসলিম যুব ও তরুণ প্রজন্ম নিজেদের ইসলামের প্রকৃত অনুসারীরূপে গড়ে তুলবে। ইলম অর্জন করার মাধ্যমে তরুণরা আল্লাহর পরিচয় জানবে। তার মারিফত লাভ করবে। একমাত্র তারই ইবাদত করবে। অন্তরে তাকওয়া ও খোদাভীতি অর্জন হবে। আল্লাহর মর্যাদা, সম্মান ও ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে এবং তদনুযায়ী নিজেদের জীবন পরিচালনা করবে। যারা ইলম ও জ্ঞান অর্জন করে আল্লাহ তায়ালা তাদের মর্যাদাকে সমুন্নত করেন। তাদের তিনি অন্যদের ওপর প্রাধান্য দেন। আর কেনই-বা নয়, ইলম হলো, জান্নাতের পথসমূহের একটি। যারা ইলম অর্জন করে তারা আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালাকে অধিক বেশি ভয় করে। তাদের অন্তর থাকে খোদাভীতিতে পরিপূর্ণ।

কেননা, তারা জানে আল্লাহ তায়ালা কোন কাজের আদেশ দিয়েছেন এবং কোন কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। সে অনুযায়ী তারা নিজেদের জীবন ও কর্ম পরিচালনা করে। ইলম অর্জনকারী আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিস তথা উত্তরাধিকারী। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে কাউকে তার ওয়ারিস বানিয়ে যাননি। একমাত্র তাদের যারা ইলম অর্জন করে। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তার বান্দাদের বেশি বেশি ইলম অর্জন করতে বলেছেন। পবিত্র কুরআনে তার প্রিয় রাসুলকে ইলম অর্জনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে মূলত সমগ্র মানবজাতিকে ইলমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

‘(হে নবী) আপনি বলুন, হে আমার প্রতিপালক আপনি আমাকে ইলম বাড়িয়ে দিন।’ [৪২]

---

৪২ সুরা তহা: ১১৪

জ্ঞান অর্জনের ফজিলত

জ্ঞান অর্জন পৃথিবীতে মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। জ্ঞান মানুষকে আলোকিত করে। আল্লাহ তায়ালার পরিচয় মানুষের হৃদয়ে প্রস্ফুটিত করে। স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন করে। আর যে জ্ঞান অর্জন থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, মূর্খতার দাসত্বে বন্দি থাকে তার জীবন হয় ঘৃণিত। সে জীবনে থাকে না আলো। থাকে না স্রষ্টার পরিচয়। ইসলামে মূর্খতার কোনো অবকাশ নেই। ইসলাম মানুষকে উপকারী জ্ঞান অর্জনে অসংখ্যবার উদ্বুদ্ধ করেছে। বর্ণনা করেছে জ্ঞান অর্জনের প্রভূত ফজিলত। জ্ঞান কল্যাণের প্রতীক। জ্ঞান জীবনের নন্দনের প্রতীক। দুনিয়া-আখেরাতে সৌভাগ্যের প্রতীক। হযরত মুআবিয়া রা. থেকে বর্ণিত আছে,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين

'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের সঠিক ইলম দান করেন।'[৪৩]

অপর হাদিসে হযরত আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত,

وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقاً يلتمس به علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً، إنما ورثوا العلم

৪৩ সহিহ বুখারি: ২৭

তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের জন্য পথ চলবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন। ফেরেশতাগণ ইলম অর্জনকারীদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদের জন্য নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন। তাদের জন্য আসমান ও জমিনের সকল কিছু ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি পানির মাছ পর্যন্ত। আলেমের মর্যাদা আবেদের ওপর, যেমন চাঁদের মর্যাদা সকল নক্ষত্রের ওপর। আলেমগণ হলেন নবীদের উত্তরাধিকারী। তারা দিনার ও দিরহামের নয়, বরং নবীদের ইলমের উত্তরাধিকারী।'[৪৪]

অপর এক হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر

'আবেদের ওপর আলেমের মর্যাদা তেমন, যেমন তোমাদের ওপর আমার মর্যাদা। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ আলেমের ওপর রহমত বর্ষণ করেন। ফেরেশতাগণ এবং আসমান ও জমিনের অধিবাসী সকলে এমনকি গর্তের পিঁপড়া ও সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত আলেমের জন্য দোয়া করে।'[৪৫]

ইলম ও আলেম সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসে অসংখ্য ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যদি আল্লাহ আপনার নিকট ওহি প্রেরণ করে বলেন, আজ রাতেই আপনি মারা যাবেন তাহলে সারাদিন আপনি কী করবেন? জবাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেছেন, আমি ইলম অন্বেষণ করব।

---

৪৪ *সুনানুত তিরমিজি*: ২৬৪৬

৪৫ *সুনানুত তিরমিজি*: ২৬৮৬

জ্ঞান অর্জনকারীর গুণাবলি

জ্ঞান এক মূল্যবান সম্পদ। দুনিয়ার কোনো বস্তু দিয়ে তা ক্রয় করা যায় না। জ্ঞান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার এক বিশেষ দান। কেবল নিজের চাওয়া-পাওয়া ও অধিক কামনার মাধ্যমেই তা অর্জন করা যায় না। জ্ঞান অর্জন করার জন্য রয়েছে কতিপয় বিশেষ শর্ত। জ্ঞান অর্জনকারীর মাঝে থাকতে হবে বিশেষ গুণাবলি। তন্মধ্যে প্রথম গুণ হলো, জ্ঞান করার জন্য প্রয়োজন উঁচু হিম্মত। জ্ঞান অর্জন করার পূর্বশর্ত হলো, ব্যক্তিকে প্রবল সাহসের অধিকারী হতে হবে। ইলম অর্জনের জন্য নিতে হবে ঝুঁকি। ঘুরে বেড়াতে হবে দেশ থেকে দেশান্তরে। হযরত আসাদ ইবনুল ফুরাত রহ. জ্ঞান অর্জন করার জন্য তার জন্মস্থান কায়রাওয়ান থেকে মদিনায় হিজরত করেন। সেখানে তিনি হযরত ইমাম মালেক রহ.-এর নিকট মুয়াত্তা মালেক শ্রবণ করেন। অতঃপর তিনি মদিনা থেকে ইরাক গমন করেন। সেখানে হযরত আবু হানিফা রহ.-এর শিষ্যদের থেকে ফিকহ শাস্ত্রে গভীর বুৎপত্তি অর্জন করেন। অতঃপর তিনি ছুটে যান ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর নিকট।

তিনি তাকে বলেন, 'আমি অনেক দরিদ্র, বহু দূর থেকে এসেছি। আমার সামর্থ্য নেই আপনার নিকট থেকে ইলম অর্জন করার।' ইমাম মুহাম্মদ রহ. বললেন, 'তুমি আমার নিকট থাকতে থাকো। দিনের বেলা ইরাকের ছেলেদের সাথে ইলম অর্জন করবে। রাতে বিশেষভাবে তুমি আমার নিকট হাদিস পড়বে। আর তুমি এখানেই রাত্রিযাপন করবে। তোমার সমস্ত দায়িত্ব আমার।' ইমাম মুহাম্মদ রহ. তাকে ইলম অর্জনের সকল ব্যবস্থা করে দিলেন। নিশ্চিন্তে তিনি সেখানে ইলম অর্জন করতে লাগলেন। হযরত আসাদ ইবনুল ফুরাত বলেন, 'আমি রাতভর পড়তাম। আমার সামনে পানির একটি পাত্র থাকত। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে যখন আমার তন্দ্রা আসত আমি চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে দিতাম।'

সালাফগণ বলেছেন, 'যে উঁচু মর্যাদা লাভ করতে চায় সে যেন রাত্রি জাগরণ করে।'

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, 'মুসাফির যদি ঘুমিয়ে পড়ে আর তার পথ হয় দীর্ঘ তাহলে সে কখনো তার গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে না।'

দ্বিতীয় গুণ

ইলম অর্জনকারীর দ্বিতীয় গুণ হলো, সময়ের মূল্যায়ন করা। যারা ইলম অর্জন করতে চায়, যারা সম্মান ও মর্যাদার সুউচ্চ আসনে সমাসীন হতে চায়, সর্বপ্রথম তাদের সময়ের মূল্য দিতে হবে। সময় অত্যন্ত মূল্যবান এক সম্পদ। সময়কে অযথা ও অনর্থক কাজে ব্যয় করা যাবে না। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا

> 'রহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং মূর্খরা যখন তাদের ডাকে তখন তারা বলে সালাম। (অর্থাৎ, তারা মূর্খদের সাথে অযথা তর্কে লিপ্ত হয়ে নিজেদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে না।)'[৪৬]

এ হলো ইলম অর্জনকারীদের দিনের অবস্থা। আর তাদের রাতের অবস্থা হবে কেমন? সে সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا

> 'যারা তাদের প্রভুর উদ্দেশ্যে সেজদারত ও দণ্ডায়মান অবস্থায় রাত কাটায়। যারা বলে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের থেকে জাহান্নামের আজাবকে দূরে রাখো। নিশ্চয়ই তার আজাব বড় সর্বনাশ।'[৪৭]

---

৪৬ সুরা ফুরকান: ৬৩

৪৭ সুরা ফুরকান: ৬৪-৬৫

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন,

وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

'যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং বাজে কথা শুনতে পেলে সম্মান বাঁচিয়ে চলে যায়।'[৪৮]

যারা ইলম অন্বেষণকারী এবং ইলম অর্জনের প্রতি রয়েছে যাদের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা, তারা ইলম ব্যতীত অন্য কোনো কাজে সময় নষ্ট করে না। কেননা, সময় অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস। তারা কেবল ইলম অর্জনের পেছনেই সময় ব্যয় করে। বর্ণিত আছে, একদা হযরত মালেক রা. মদিনায় হাদিসের দরস দিচ্ছিলেন। হঠাৎ বাহিরে শোরগোল শোনা গেল। ছেলেরা চিৎকার চেঁচামেচি করছে। ছুটোছুটি করছে। খবর এলো, মদিনায় হাতি এসেছে। তখন মদিনায় হাতি ছিল বিরল প্রাণী। কদাচিৎ এর দেখা মিলে। ছাত্ররা সবাই দৌড়ে চলে গেল হাতি দেখতে। কিন্তু একজন ছাত্র বসে আছে। তিনি ইয়াহইয়া উন্দুলুসি। সুদূর স্পেন থেকে মদিনায় এসেছেন হযরত ইমাম মালেকের নিকট থেকে হাদিসের ইলম অর্জন করার জন্য। তিনি বসে আছেন শুধু। বাকিরা চলে গেছে হাতি দেখতে। ইমাম মালেক রহ. তাকে বললেন, সকলে হাতি দেখতে গেছে, ইয়াহইয়া তুমি যাও। মদিনায় সাধারণত হাতি আসে না। তুমি কেন হাতি দর্শনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে? তখন ইয়াহইয়া উন্দুলুসি জবাবে বলেন, আমি স্পেন থেকে এসেছি আপনার নিকট থেকে ইলম অর্জন করতে, হাতি দেখতে নয়।' ইতিহাসের পাতায় তার জবাব স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

সুতরাং ইলম অন্বেষণকারীদের একটি অন্যতম গুণ হবে সময়কে সংরক্ষণ করা। অযথা ও অনর্থক কাজে মূল্যবান সময় নষ্ট না করা। সময় স্বর্ণের চেয়ে দামি। পৃথিবীতে এর চেয়ে আর কোনো দামি বস্তু সৃষ্টি হয়নি। সকল বস্তুই একবার চলে পুনরায় ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু সময় এমন এক মূল্যবান জিনিস যা চলে গেলে আর কখনো ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই।

---

৪৮ সুরা ফুরকান: ৭২।

তৃতীয় গুণ

ইলম অর্জনকারীর তৃতীয় গুণ হলো, ইলম অনুযায়ী আমল করা। যে যুবক ইলম অর্জন করতে চায় সে যেন অর্জিত ইলম অনুযায়ী আমল করে। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি গুণ। কেননা, ইলম অর্জন করার পর যদি ইলম অনুপাতে আমল না করে তাহলে কেয়ামতের দিন অর্জিত ইলম তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। আমলহীন আলেমের শাস্তি অত্যন্ত কঠিন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه

> 'কেয়ামতের দিন লোকদের মধ্যে সর্বাধিক কঠিন শাস্তি ভোগ করবে ওই আলেম যে তার ইলম দ্বারা উপকৃত হয়নি। অর্থাৎ যে আলেম তার ইলম অনুযায়ী আমল করেনি।'[৪৯]

এক ছাত্র ইমাম গাজালি রহ.-কে কিছু নসিহত করতে বলল। তখন ইমাম গাজালি রহ. বললেন, 'নসিহত করা সহজ, কিন্তু কঠিন হলো, নসিহতকে কবুল করা। তদনুযায়ী আমল করা।'

---

৪৯ আল মুজামুস সগির-১/১৮৩

রাতের বেলা ইবাদত করা

যদি তুমি দিনের বেলা আল্লাহর নিকট প্রিয় হতে চাও তাহলে তোমাকে রাতের বেলা আল্লাহর নিকট প্রিয় হতে হবে। রাতের অন্ধকার আল্লাহর নিকট প্রিয় হওয়ার সর্বোত্তম ও সুবর্ণ সুযোগ। যুবকদের জন্য করণীয় হলো, রাতের অন্ধকারে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করা। বিগলিতচিত্তে রবের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকা। বিনয়াবনত হয়ে নামাজ পড়া। পরম ভালোবাসার সাথে রুকু করা। অত্যন্ত ভক্তি ও আবেগের সাথে আল্লাহর সামনে সিজদাবনত হওয়া। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন,

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا

'রাতে (ইবাদতের জন্য) ওঠা (প্রবৃত্তিকে) শক্তভাবে দমনে এবং (কথা) সঠিকভাবে উচ্চারণে অত্যন্ত সহায়ক।'[৫০]

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন,

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا

'তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে পৃথক হয়। আশা নিয়ে তারা তাদের প্রভুকে ডাকে এবং তাদের যা দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে।'[৫১]

রাতের অন্ধকারে নামাজ পড়া শ্রেষ্ঠ ইবাদতসমূহের একটি। ফরজ ইবাদতের পর এটি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে অধিক সহায়ক। যাকে কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদের নামাজ বলা হয়। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে অধিক নামাজ পড়তেন; এমনকি নামাজে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার পা মুবারক ফুলে যেত। যখন এ ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, তখন তিনি বলেছেন,

أفلا أكون عبداً شكوراً؟

অর্থাৎ, 'আমি কি আমার প্রভুর কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?'

---

৫০ সুরা মুজাম্মিল: ৬

৫১ সুরা সিজদা: ১৬

রাতের গভীরে আল্লাহর সম্মুখে নামাজে দণ্ডায়মান হওয়া শ্রেষ্ঠ ও আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় ইবাদতসমূহের একটি। যে যুবক রাতে তার রবের সামনে নামাজে দাঁড়াবে তার যৌবনকাল অতিবাহিত হবে উত্তমভাবে। আল্লাহ তায়ালার সাথে তার সম্পর্ক হবে সুদৃঢ়। তার অন্তর হবে প্রশস্ত। তার ঈমান হবে শক্তিশালী। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের নামাজ সম্পর্কে ইরশাদ করেন,

أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل

> 'ফরজ নামাজের পর সর্বশ্রেষ্ঠ নামাজ হলো ওই নামাজ যা রাতের গভীরে আদায় করা হয়।'[৫২]

হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন ব্যক্তির কথা বলেছেন যাদের আল্লাহ তায়ালা ভালোবাসেন। উক্ত তিন ব্যক্তির মধ্যে এক প্রকার হলো তারা, যারা রাতে তাদের রবের সামনে নামাজের জন্য দাঁড়ায়। যাদের নিকট ঘুমের চেয়ে নামাজ প্রিয়। এবং দীর্ঘক্ষণ তারা এভাবে নামাজে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের রবকে স্মরণ করে।

রাতে কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করার গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে সকলেই অবগত। বান্দা যখন রাতের আরাম-আয়েশকে বিসর্জন দিয়ে গোপনে তার রবের সামনে নামাজে দাঁড়ায় তখন আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কেউ তাকে দেখতে পায় না। ফলে তখন তার মাঝে ইখলাস ও নিষ্ঠা থাকে পূর্ণমাত্রায়। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা অত্যধিক পছন্দ করেন যে, বান্দা কেবল আমার ইবাদত করবে। আমার সাথে আর কাউকে শরিক করবে না। এ জন্যই যারা মুনাফিক তারা রাতের গভীরে নামাজ পড়ে না। কারণ, তারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে না। আল্লাহ তায়ালার একনিষ্ঠ বান্দাগণই কেবল রাতে ইবাদত করে।

রাতের ইবাদতের মাঝে লুকিয়ে আছে মুমিনের শক্তি। মুমিনগণ এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সাহায্য কামনা করে। ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে, মুমিনদের বিজয়ের পেছনে রয়েছে রাতের নামাজ ও চোখের বিগলিত অশ্রু। বদর যুদ্ধ সম্পর্কে হযরত আলি রা. বর্ণনা করেছেন যে, যুদ্ধের আগের দিন রাতে আমরা ভোর পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদত,

---

৫২ *সহিহ মুসলিম*: ২০৬৯

দোয়া ও কান্নাকাটিতে কাটিয়ে দিই। যার ফলশ্রুতিতে পরদিন যুদ্ধের রণাঙ্গনে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের সাহায্যের জন্য আসমান থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ফেরেশতা প্রেরণ করেছেন এবং মুসলমানদের বিজয় দান করেছেন। শুধু বদর যুদ্ধ নয়, ইসলামের সকল যুদ্ধের চিত্রই এমন। রাতের ইবাদতের মাঝে আল্লাহ তায়ালা বিশেষ একটি পাওয়ার দান করেছেন যা অন্যান্য ইবাদতে দান করেননি। এর কারণ তো এই যে, তখন বান্দা কেবল আল্লাহর জন্য ইবাদত করে। তার সাথে কাউকে শরিক করে না। আর না কাউকে দেখানোর জন্য ইবাদত করে। জেনে রেখো! মুমিনের শক্তির রহস্য লুকিয়ে আছে কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদের মাঝে। বান্দা যখন অত্যন্ত কঠিন সময়ের মুখোমুখি হয় তখন রাতের গভীরে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। বান্দার ওপর আরোপিত কঠিন মুহূর্তে রাতের ইবাদতের প্রতি ধাবিত হয়। আল্লাহ তখন বান্দাকে সাহায্য করেন। আল্লাহ তখন বান্দার কঠিনকে করে দেন সহজ। আল্লাহ তায়ালা বদরে মুসলমানদের সেই কঠিন সময়ের কথা বর্ণনা করে ইরশাদ করেন,

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ

> 'যখন তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছিলে এবং তিনি তোমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে বলেছিলেন, আমি তোমাদের এক হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে সাহায্য করব; যারা একজনের পেছনে আরেকজন ক্রমান্বয়ে আসতে থাকবে।' [৫৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সাহাবি এবং ইসলামের সোনালি যুগের যুবকদের নিকট রাতের ইবাদত ছিল অত্যন্ত প্রিয়। রাতের গভীরে অত্যধিক নামাজ ও অশ্রুপাত তাদের আসীন করেছে সর্বোচ্চ চূড়ায়। ইমাম যাহাবি রহ. বলেন, হযরত আলি ইবনে হুসাইন ইবনে যাইনুল আবেদিন রাতভর ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন। যখন দিন ফুরিয়ে যেত এবং রাত আগমন করত তখন তিনি অজু করে বিছানায় যেতেন। আর বলতেন, 'কতই-না উত্তম এ রাত্রি। জান্নাতে রয়েছে এর চেয়েও উত্তম। এর চেয়ে অধিক

---

৫৩ সুরা আনফাল: ৯

প্রশান্তি। আর বলতেন, সকাল পর্যন্ত আমি ইবাদত করব।' হ্যাঁ, তিনি ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। যখন সকাল হতো তখন চেহারায় নূর চমকাতো। একটি উজ্জ্বল আলো তার মুখমণ্ডলে জ্বলজ্বল করত।

হযরত হাসান বসরি রহ. বলেন, 'যারা রাতে ইবাদত করে তাদের নুরের পোশাক পরিধান করানো হয়। নুর তাদের সর্বদা বেষ্টন করে রাখে।'

বিনিদ্র রজনী যারা ইবাদত করতেন তাদের মধ্যে একজন হলেন, হযরত রাবি ইবনে হায়সাম রহ.। তিনি রাতভর ইবাদত, নামাজ, জিকির ও কান্নাকাটিতে কাটিয়ে দিতেন। এবং এর পরিণাম এতই অধিক ছিল যে, তার মা তাকে একদিন জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কেন রাতভর না ঘুমিয়ে এত ইবাদত করো? তুমি কি কাউকে হত্যা করেছ যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না?' জবাবে রাবি ইবনে হায়সাম বলেন, 'হ্যাঁ, আমি নিজেকে গোনাহ ও অবাধ্যতা দ্বারা হত্যা করেছি।' হযরত রাবি ইবনে হায়সাম ছিলেন সাহাবি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর শিষ্য। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. তার সম্পর্কে বলেন, 'যদি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে দেখতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি তোমাকে ভালোবাসতেন।'

যুবকদের মর্যাদা

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন,

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا

'যে সম্মান চায় তার জানা উচিত, যাবতীয় সম্মান একমাত্র আল্লাহর জন্য।'[৫৪]

অপর আয়াতে ইরশাদ করেন,

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

'আসলে সম্মান তো আল্লাহর, তার রাসুলের এবং মুমিনদের। কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।'[৫৫]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছেন এবং মদিনায় ইসলামের প্রচার-প্রসার করছেন। মদিনার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে ঈমানের আলো। মদিনার লোকেরা দলে দলে মুসলমান হতে লাগল। কিন্তু এ দৃশ্যে গাত্রদাহ শুরু হলো ইসলামের শত্রুদের। কাফের মুশরিকরা মুসলমানদের এ অগ্রযাত্রাকে যে-কোনো মূল্যে রুখে দিতে চাইল। আর এ জন্য তারা গ্রহণ করল একটি মাস্টারপ্ল্যান। মদিনার চারপাশের সকল গোত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হলো। তারা যে-কোনো মূল্যে ইসলামের আলোকে নিভিয়ে দিতে চায়। থামিয়ে দিতে চায় কালিমার অগ্রযাত্রাকে। মদিনায় ইসলাম ও মুসলমানদের তখন নিদারুণ ক্রান্তিকাল। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা মুসলমানদের সে অবস্থা বর্ণনা করে বলেন,

---

৫৪ সুরা ফাতির: ১০
৫৫ সুরা মুনাফিকুন: ৮

إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا

'যখন তোমাদের উপরের দিক থেকে ও নিচের দিক থেকে শত্রুরা তোমাদের দিকে এসেছিল, যখন ভয়ে তোমাদের দৃষ্টিসমূহ নিস্তেজ হয়ে এসেছিল ও হৃৎপিণ্ডগুলো গলার কাছে চলে এসেছিল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা রকম সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করেছিলে। সেখানেই মুমিনরা পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছিল এবং দারুণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল।'[৫৬]

মদিনায় মুসলমানদের তখন নিদারুণ ক্রান্তিকাল। দ্বীন ও জাতির এমন কঠিন মুহূর্তে এবং ঘোরতর বিপদের সময় ঈমানদার যুবকদের মর্যাদা পরিলক্ষিত হয়। প্রস্ফুটিত হয় মুসলিম যুবকদের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন, মদিনা ও মদিনার আশপাশের ইহুদি-খ্রিষ্টান ও কাফের মুশরিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। সম্মিলিত জোট হয়ে তারা মুসলমানদের মদিনা থেকে বিতাড়িত করতে চাচ্ছে। নিভিয়ে দিতে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে আল্লাহর দ্বীনকে। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনার গাতফান গোত্রের দুজন নেতার সাথে গোপনে সাক্ষাৎ করলেন এবং উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গাতফান গোত্রের মনোভাব জানলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারলেন, গাতফান গোত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো সম্পদ। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের কোনো প্রকার শত্রুতা নেই। তাদের উদ্দেশ্য ধন-সম্পদ। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সন্ধির প্রস্তাব দিলেন। যেন তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জোটের অভিযানে অংশগ্রহণ না করে। এর মাধ্যমে মদিনাবাসীর ওপর শত্রুদের চাপ কিছুটা হলেও লাঘব হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে মদিনার মুসলমানদের এক তৃতীয়াংশ ফসলের বিনিময়ে সন্ধি করলেন। তবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি শর্ত দিলেন। শর্তটি হলো, তিনি এ ব্যাপারে সাদ ইবনে

---

৫৬ সুরা আহযাব: ৯-১০

মুয়াজ রা.-যিনি আউস সম্প্রদায়ের নেতা-এবং সাদ ইবনে উবাদা রা.-যিনি খাজরাজ গোত্রের নেতা-এ দুজনের সাথে পরামর্শ করে তবেই সন্ধিপত্র চূড়ান্ত করবেন।

হযরত সাদ ইবনে মুয়াজ এবং হযরত সাদ ইবনে উবাদা রা. দুজনই ছিলেন বয়সে পরিণত যুবক। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় ইসলাম ও মুসলমানদের চরম সঙ্কটপূর্ণ দিনে দুজন যুবকের সাথে পরামর্শ করে গাতফান গোত্রের সাথে সন্ধিচুক্তি চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সকলের ওপর দুজন যুবক সাহাবিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। মদিনায় তখন আরো অনেক প্রবীণ সাহাবি ছিলেন। কিন্তু পরামর্শ ও সিদ্ধান্তের জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলের মধ্যে কেবল দুজন যুবক সাহাবিকে নির্বাচন করলেন। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে পরামর্শ করে গাতফান গোত্রের সাথে সন্ধি চূড়ান্ত করলেন। ইসলাম ও মুসলমানদের কঠিনতম দিনে যুবকদের মর্যাদা পরিলক্ষিত হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

'আসলে সম্মান তো আল্লাহর, তার রাসুলের এবং মুমিনদের। কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।'[৫৭]

মুসলিম যুবকদের মর্যাদার কথা পবিত্র কুরআনেই বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন,

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِن
يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ
نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ
شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا

---

৫৭ সুরা মুনাফিকুন: ৮

وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

'শত্রুর সামনে তোমরা দুর্বল ও বিষণ্ন হয়ো না। ঈমানদার হলে তোমরাই বিজয়ী হবে। যেদি তোমাদের কোনো আঘাত লাগে তাহলে মনে করবে অনুরূপ আঘাত তো অন্যদেরও লেগেছে। আর এই দিনগুলো আমি মানুষের মধ্যে অদলবদল করি; যাতে আল্লাহ মুমিনদের যাচাই করতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে শহিদদের গ্রহণ করতে পারেন। আল্লাহ জালেমদের ভালোবাসেন না। এবং যাতে তিনি মুমিনদের সংশোধন আর কাফেরদের নির্মূল করতে পারেন। আল্লাহ তোমাদের মধ্য থেকে জিহাদকারী ও ধৈর্যধারণকারীদের যাচাই করতে পারেন।' [৫৮]

পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী কাফের মুশরিক, ইহুদি, খ্রিষ্টান তারা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মদিনায় আক্রমন করল। কিন্তু সেদিন ঈমানদার যুবকরা তাদের দ্বীনের ওপর ছিল অটল। তারা সেদিন সাহায্য করেছে ইসলামকে। মুসলিম যুবকদের সম্মিলিত প্রতিরোধ ও প্রচেষ্টায় শত্রুর বিশাল দল পলায়ন করতে বাধ্য হয়। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ

'আল্লাহ কাফেরদের তাদের ক্রোধ নিয়েই ফিরিয়ে দিলেন। তারা কোনো কল্যাণ লাভ করতে পারেনি। যুদ্ধে মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ হলেন মহাশক্তিধর ও পরাক্রমশালী।'[৫৯]

---

৫৮ সুরা আলে ইমরান: ১৩৯-১৪২

৫৯ সুরা আহযাব: ২৫

মদিনায় তখন মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল নিতান্তই স্বল্প। কিন্তু আল্লাহ ঈমানদারদের সাহায্য করেছেন। ঈমানদারদের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ স্বয়ং দিয়েছেন,

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

'তোমরা দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও বদরে আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়ী করেছিলেন। অতএব আল্লাহকে ভয় করো। যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো।'[৬০]

সাহাবায়ে কেরাম রাতের অন্ধকারে ছিলেন সাধক এবং দিনের আলোতে ছিলেন সাহসী ঘোরসওয়ার। আজ পৃথিবীতে মুসলমানরা একমাত্র লাঞ্ছিত, নির্যাতিত। দেশে দেশে আজ মুসলমানদের ওপর চলছে ইতিহাসের ভয়াবহ জুলুম। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে এবং কাঙ্ক্ষিত বিজয় ছিনিয়ে আনতে হলে প্রয়োজন মুসলিম যুবকদের জাগরণ। মুসলিম যুবকদের সাহাবায়ে কেরামের আদর্শে আদর্শিত হতে হবে। সাহাবায়ে কেরামের মতো রাতের সাধক এবং দিনের ঘোরসওয়ার হতে হবে।

---

৬০ সুরা আলে ইমরান: ১২৩

আল্লাহ ও মুসলিম যুবকদের মাঝে সম্পাদিত হয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা হলেন ক্রেতা, যুবকরা হলো বিক্রেতা। আর দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মূল্য হলো জান্নাত। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

'হে নবী! যারা আপনার নিকট বাইয়াত করে, তারা মূলত আল্লাহর কাছেই বাইয়াত করে। তাদের হাতের উপর রয়েছে আল্লাহর হাত। সুতরাং যে তা ভঙ্গ করে সে নিজেরই ক্ষতি করে। আর যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করে তাকে তিনি বড় এক বড় পুরস্কার (জান্নাত) দেবেন।'[৬১]

যুবকদের একটি বড় গুণ হলো, যুবকরা হয় প্রচণ্ড সাহসী। তাদের শিরায় শিরায় বীরত্ব। তাদের দমনীতে প্রবাহিত হয় উষ্ণ রক্ত। যুবকরা হলো আল্লাহর সৈনিক। তাদের চেতনা হলো, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠা করা এবং কাফেরদের পরাজিত ও অপদস্থ করা। যুবকদের প্রতীক হলো,

نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما بقينا أبداً

'আমরা আজন্ম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর জিহাদের বাইয়াত গ্রহণ করেছি।

৬১সুরা ফাতহঃ ১০

যুবকদের শ্লোগান হলো,

كنا جبالاً فوق الجبال وربما صرنا على موج البحار بحاراً

'আমরা পাহাড়ের চেয়েও সুদৃঢ়। আমাদের হৃদয় সমুদ্রেরও অধিক তরঙ্গবিক্ষুব্ধ।'

যুবকদের হাতছানি দিচ্ছে জান্নাত। আর তারাও জান্নাতকে হাতছানি দিচ্ছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর নেমে এলো আকস্মিক মহা বিপর্যয়। দিকে দিকে ফেতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। ইসলাম ত্যাগ করে অনেকে মুরতাদ হয়ে যাচ্ছিল। কোনো কোনো ভণ্ড ও প্রতারক নিজেকে নবী বলে দাবি করে। মুসলমানদের অনেকে ঈমান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। মুসলমানদের মধ্যে তখন যারা ইসলামের ওপর অটল ছিলেন তারা ইসলামকে সাহায্য করেন। পাহাড়ের মতো অটল থেকে তারা ইসলামের ওপর আরোপিত সকল ফেতনা মোকাবেলা করেন। হযরত আবু বকর রা. নিজ মনোবলকে অত্যন্ত সুদৃঢ় করেন। খেলাফতের আসনে বসে তিনি সেসব ফেতনা মোকাবেলা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সমগ্র মুসলমানদের তিনি এগারটি দলে বিভক্ত করেন। তাদের মাঝে নিযুক্ত করেন এগার জন সেনাপতি। তাদের হাতে তুলে দেন এগারটি পতাকা। তাদের তিনি যুদ্ধের সরঞ্জাম দিয়ে আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করেন।

সর্বাধিক বড় ফিতনা ছিল তখন মুসাইলামা। মুসাইলামা নিজেকে নবী বলে দাবি করে। তার সাথে তার গোত্রের লোকেরা ঐক্যবদ্ধ হয়। সংখ্যায় ছিল তারা চল্লিশ হাজার। হযরত আবু বকর রা. তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের শক্তিশালী একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন। সেনাপতি নিযুক্ত করেন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-কে। হযরত আবু বকর রা. বলেন, মুসাইলামার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য খালিদকে প্রয়োজন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. ছিলেন একজন যুবক সাহাবি। সাহসিকতা ও বীরত্বে তিনি ছিলেন মুসলমানদের মধ্যে সেরা। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সাইফুল্লাহ তথা আল্লাহর তরবারি বলে উপাধি দিয়েছেন।
হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. আনসার ও মুহাজিরদের একটি কাফেলা নিয়ে রওনা হলেন ইয়ামামার প্রান্তরে। মুসাইলামার বাহিনী সেখানে প্রস্তুত ছিল। উভয় দল মুখোমুখি হলো। সৈন্যসংখ্যায় কাফেররা ছিল অধিক।

মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। তবুও তাদের ভয় নেই। কেননা, তাদের জন্য সাহায্য প্রেরিত হয় আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে। মুসলমানদের বিজয় লেখা হয় আল্লাহর কুদরতি হাতে। রবের পক্ষ থেকে তাদের দেওয়া হয় যুদ্ধের নির্দেশনা। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا . تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ

'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি হবে তখন তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে না।'[৬২]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কোনো বাহিনীর মুখোমুখি হবে তখন অবিচল থাকবে এবং আল্লাহকে স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।'[৬৩]

শুরু হলো উভয় বাহিনীর লড়াই। ইয়ামামার প্রান্তরে মুসাইলামা ও হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর বাহিনীর মধ্যে চলছে তুমুল সংঘাত। মুসলিম বাহিনীর মধ্যে ছিলেন হযরত বারা ইবনে মালিক রা.। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী এক যোদ্ধা। শক্তি ও বিচক্ষণতার সমাহার ছিল তার মধ্যে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রতিটি যুদ্ধেই সাহস ও রণকৌশলের স্বাক্ষর রেখেছেন। মুসলিম শিবিরে প্রসিদ্ধ ছিল তার অসীম বীরত্বের কথা।

নবীজির প্রতি হযরত বারা রা. এর ভালোবাসা ছিল অত্যধিক। সে ভালোবাসা ছিল মরুভূমির বালির চেয়েও অধিক। চাঁদের জোছনার মতো কোমল। সূর্যের মতো নিখাদ ও শানিত। হযরত বারা ইবনে মালেকের সাহস ও নবীর প্রতি

---

৬২ সুরা আনফাল: ১৫
৬৩ সুরা আনফাল: ৪৫

অসীম ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি লড়ে যাচ্ছেন প্রচণ্ড বীরবিক্রমে। তার বীরত্ব টগবগ করে উঠছে জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মতো। যুদ্ধ চলছে তুমুল তুফানে। ক্ষিপ্রগতিতে মুসলিম সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ে কাফেরদের ওপর। উভয় পক্ষ সমানে সমান। কেউ ছাড় দিতে রাজি নয় আজ। না মুসলিম বাহিনী। না মুসায়লামার দল। এ লড়াই নিছক জয়-পরাজয়ের লড়াই নয়; সত্য ও মিথ্যার এক চূড়ান্ত পার্থক্যকারী যুদ্ধ।

যুদ্ধের মাঝেই সেনাপতি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ নিজ ঘোড়ার ওপর দাঁড়িয়ে তেজস্বী কণ্ঠে মুসলিম বাহিনীকে উদ্দেশ্য করে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। তিনি বলেন, 'হে মদিনার অধিবাসীগণ! আজ তোমরা অন্তর থেকে মদিনার চিন্তা মুছে ফেলো। আজ তোমাদের অন্তরে থাকবে কেবল আল্লাহ এবং জান্নাতের স্মরণ। আজকের এ লড়াই আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে নিশ্চিত হবে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য।'
সেনাপতি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর এমন অগ্নিময় ভাষণ শুনে দ্বিগুণ শক্তিতে জ্বলে ওঠেন হযরত বারা ইবনে মালিক। তার রক্তে বলখ মেরে উঠে সাহস ও শৌর্যের আগুন। নতুন প্রেরণায় তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন শত্রুর ওপর। নাঙা তলোয়ার উঁচিয়ে প্রবল তেজে তিনি ঘোড়া ছুটিয়েছেন শত্রুর দিকে।

তারপর একের-পর-এক বীর পাহলোয়ান যোদ্ধাকে ধরাশয়ী করে মাটিতে ফেলে দেন হযরত বারা। তারপর পেটে তলোয়ার ঢুকিয়ে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেন মুহূর্তের মধ্যে। রক্তে মেখে যায় তার ঘোড়ার পা। মুসলিম বাহিনীর আক্রমণের প্রচণ্ডতায় মুসায়লামার বাহিনী পিছু হঠতে বাধ্য হয়। ইয়ামামার অদূরে ছিল প্রাচীরবেষ্টিত একটি বাগান। মুসায়লামা লুকিয়ে ছিল বাগানের ভেতর। মুসাইলামার বাহিনী পিছু হঠতে হঠতে বাগানের নিকটবর্তী হলে মুসাইলামা তাদের প্রাচীরের ভেতর চলে আসতে আহ্বান করে। শত্রুরা প্রাচীরের ভেতর প্রবেশ করলে প্রাচীরের ফটক বন্ধ করে দেওয়া হয়।

দুঃসাহসী বারা রা.। শত্রুপক্ষকে পিছু হঠিয়ে তবুও শীতল হয় না তার রক্তে জ্বলা আগুন। টগবগ করতে থাকে সাহসের প্রচণ্ডতায়। সঙ্গী সৈনিকদের বলেন তিনি, আমাকে প্রাচীরের ওপারে নিক্ষেপ করো। আমি লড়ব তাদের সাথে। মুসাইলামার একটা দফারফা না করে আজ ফিরব না।'
কিন্তু হযরত বারা ইবনে মালিকের কথায় প্রথমে অমত করে বাকিরা। তারা চান না, বারা ইবনে মালিক নিজেকে শত্রুর হাতে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পতিত

হোক। সকলেই নিষেধ করলেন বারা ইবনে মালিককে। কিন্তু, তিনি অনড় নিজের সিদ্ধান্তে। নবীর দুশমনদের আজ অমনি অমনি ছেড়ে দেবেন না। সঙ্গীদের পীড়াপীড়ি করতে থাকেন তিনি। তার অনড় সিদ্ধান্তের সামনে নতি স্বীকার করলেন সাহাবায়ে কেরাম। প্রাচীরের উপর উঁচু করে তুলে ধরেন তারা হযরত বারা ইবনে মালিককে। প্রাচীরের উপর বসে প্রথমে ভেতরটা ভালো করে পরখ করে নেন তিনি।

অতঃপর ঝাঁপিয়ে পড়েন প্রাচীরের ভেতরে। ক্ষিপ্র বাঘের মতো তিনি হামলে পড়েন। অতর্কিত আক্রমণ করতে থাকেন শত্রুদের ওপর। হযরত বারা ইবনে মালিকের অমন অতর্কিত আক্রমনের কথা ভাবতেই পারেনি শত্রুপক্ষ। তার আচানক হামলায় দিশেহারা হয়ে পড়ে মুসাইলামার দল। তারা বাগানের ভেতর দিগ্বিদিক ছুটোছুটি করতে থাকে। পালাতে থাকে কেউ কউে এদিক-সেদিক। সুযোগ বুঝে বাগানের ফটক খুলে দেন হযরত বারা। আর অমনি মুসলিম সৈন্যরা হুমড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ে দূর্গের ভেতরে। আর রক্ষা কোথায় তাদের। বেধড়ক তলোয়ার চালাতে থাকেন মুসলিম সৈন্যরা। মুসলমানদের তরবারি ফায়সালা করতে থাকে ভণ্ড প্রতারকদের। মুহূর্তে রক্তে ছেয়ে যায় প্রাচীরঘেরা বাগান। একটি আঘাত মুসাইলামার জীবন সাঙ্গ করে দেয়। লুটিয়ে পড়ে মুসাইলামা। তারপর আরেকটি আঘাত, তারপর আরেকটি...। দুনিয়া থেকে চিরবিদায় হলো মিথ্যা নবী দাবিদার মুসাইলামা। মুসলমান সৈন্যরা শত্রুদের ধরে ধরে হত্যা করতে থাকে। বিশ হাজার শত্রুকে সেদিন হত্যা করা হয়। বাকিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। যুদ্ধে পরাজিত হয় মুসাইলামার বাহিনী। ইয়ামামার ধূসর প্রান্তরে রচিত হয় এক যুগান্তকারী ইতিহাসের। ইয়ামামার যুদ্ধে হযরত বারা ইবনে মালিক দুঃসাহসী ভূমিকা পালন করেন। সেনাপতি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং হযরত বারা ইবনে মালেক রা.-এর অসীম বীরত্বে জয়লাভ করে মুসলমানরা। ইয়ামামার প্রান্তরে রচিত হয় নতুন ইতিহাস। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান ও নবুওয়াত রক্ষার প্রথম নজরানা

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

'কাফেরদের সাথে যখন যুদ্ধের ময়দানে তোমাদের মোকাবেলা হবে তখন তাদের গর্দানে আঘাত করবে। অবশেষে যখন তোমরা তাদের রক্তপাত ঘটাবে তখন বাকিদের শক্ত করে বাঁধবে। তারপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ করবে অথবা মুক্তিপানের বিনিময়ে ছেড়ে দেবে। যতক্ষণ না যুদ্ধ তার বোঝা নামিয়ে রাখে। এটিই আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ চাইলে তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন, কিন্তু তিনি চান তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে। তবে যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদের আমল তিনি কিছুতেই নষ্ট করবেন না। তিনি তাদের সেই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার কথা তিনি তাদের জানিয়ে দিয়েছেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য করো তাহলে তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা সুদৃঢ় রাখবেন।'[৬৪]

---

৬৪ সুরা মুহাম্মদ: ৪-৭

যুবসমাজের অবক্ষয় ও তার পরিবর্তন

বর্তমান যুবসমাজের মারাত্মক অবক্ষয় ঘটেছে। তাদের চরিত্র নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাদের চেতনার বিলুপ্তি ঘটেছে। সোনালি যুগের সেসব যুবক যাদের হাতে রচিত হয়েছে ইসলামের ইতিহাস, আজ যুবসমাজ কল্যাণের সেই পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে। তাদের অন্তরে বাসা বেঁধেছে চরম গাফলত ও সীমাহীন আলস্য। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন,

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا
الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

'তাদের পরে এমন এক প্রজন্ম এলো যারা নামাজ বিনষ্ট করল এবং প্রবৃত্তির বশবর্তী হলো। অতএব তারা ভ্রষ্টতার পরিণতি দেখতে পারে।'[৬৫]

সোনালি যুগের যুবকদের পর এলো এমন এক প্রজন্ম, যারা তাসবিহ, তাহলিল ও তাকবিরের পরিবর্তে অনর্থক কথাবার্তা এবং গাল-গল্পে মেতে থাকে। তারা মিসওয়াকের পরিবর্তে হাতে তুলে নিয়েছে সিগারেট ও নেশাজাতীয় দ্রব্য। কুরআনের পরিবর্তে হাতে তুলে নিয়েছে পত্রিকা ও অশ্লীল বিভিন্ন ম্যাগাজিন। ইলমি মজলিসকে রূপান্তর করেছে গান-বাদ্য ও সিনেমা-নাটকের দ্বারা। কুরআন তিলাওয়াত ও শ্রবণের পরিবর্তে আজকের যুব প্রজন্ম অশ্লীল গান ও মিউজিক শ্রবণ করছে। তারা ভুলে গিয়েছে জিহাদ। জিহাদের পরিবর্তে তারা মেতে উঠেছে ভ্রষ্টতা ও হঠকারিতায়। আজকের যুব ও তরুণ প্রজন্ম অবক্ষয়ের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গিয়েছে। তাদের অন্তরে নেই ইসলামের জন্য আবেগ ও ভালোবাসা। মুমিনদের জন্য নেই দায়িত্ববোধ। আল্লাহর দেওয়া প্রতিশ্রুতি তারা ভুলে গিয়েছে। কোথায় সেসব যুবক আর কোথায় আজকের যুব প্রজন্ম?

কী হলো, আজ মুসলমানদের মধ্যে নেই সেসব ব্যক্তি। নেই সাদ ও মিকদাদ রা.-এর মতো সাহসী যুবক। নেই খালিদ ও বারা ইবনে মালেক রা.-এর মতো বীর তরুণ। আজকের যুবকদের ঈমান হয়ে গিয়েছে দুর্বল ও ভঙ্গুর।

---

৬৫ সুরা মারইয়াম: ৫৯

তাদের ঈমানে নেই তেজোদীপ্ততা। তাদের অন্তরে নেই সাহসের বারুদ। নিভে গিয়েছে তাদের চেতনার আগুন। আজ তারা মৃত। তাদের দেহ মৃত। তাদের অন্তর মৃত। তাদের ঈমান মৃত। অথচ যুবক ও তরুণরাই হলো জাতির শক্তি। জাতির মূল স্প্রিট। অতীতে মুসলিম তরুণদের হাতেই রচিত হয়েছে বিজয়ের ইতিহাস। তাদের গর্জনে কেঁপে উঠেছে শত্রুর হৃদপিণ্ড। বর্তমানে তাদের চেয়ে আরো অধিক সাহসী তরুণদের প্রয়োজন। ইসলাম ও মুসলমানদের আজ চলছে নিদারুণ ক্রান্তিকাল। পৃথিবীর সর্বত্র আজ তারা নির্যাতিত নিপীড়িত। তাদের আর্তনাতে ভারী হয়ে উঠেছে আকাশ বাতাস। উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু সর্বত্র আজ অসহায় মুসলমানদের আর্তনাদ। আজ তাই প্রয়োজন সেসব সাহসী যুবকদের, যারা রচনা করবে উম্মাহর নতুন ইতিহাস। যারা মুক্ত করবে অসহায় মুসলমানদের। হে যুবক! ফিরে এসো। ফিরে এসো রবের দিকে। ঈমানের আলোয় ফিরে এসো। অবাধ্যতা ও নাফরমানির বৃত্ত ভেঙ্গে ফিরে এসো আনুগত্য ও কল্যাণের পথে। আজ বড়ই প্রয়োজন তোমাদের। তোমাদের হতে হবে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার এই আয়াতের আদর্শ।

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى

'তারা ছিল কয়েকজন যুবক, যারা তাদের প্রভুর প্রতি ঈমান এনেছিল এবং তাদের হেদায়েতকে আমি বৃদ্ধি করেছি।' ৬৬

৬৬ সুরা কাহফ: ১৩

হে যুবক! এসো আত্মশুদ্ধির মোহনায়

যৌবনকাল মানবজীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ব্যক্তির এক জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতার মাপকাঠি হলো যৌবনকাল। যার যৌবনকাল হবে সোনালি তার পরবর্তী পূর্ণ জীবন হবে সুখকর ও কল্যাণময়। আর যার যৌবনকাল কাটবে উদাসীনতা আর আলস্যে তার পরবর্তী জীবন হবে দুর্ভোগের। সুতরাং মানবজীবনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো যৌবন। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে প্রথমে তার সমগ্র জীবনের হিসাব জিজ্ঞেস করবেন, অতঃপর বিশেষভাবে তার যৌবনকাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। যৌবনকাল কি মানুষের পুরো জীবনের অন্তর্ভুক্ত নয়? হ্যাঁ, যৌবনকাল পূর্ণ জীবনের অন্তর্ভুক্ত। তথাপিও কেন আল্লাহ তায়ালা বান্দার যৌবনকাল সম্পর্কে পুনরায় বিশেষভাবে হিসাব নেবেন? এর কারণ হলো, যৌবনকাল হলো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। যৌবনকালে বান্দা যা করতে পারে তা পরবর্তীতে করতে পারে না। যৌবনকালের সাথে সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে বিশেষ কতিপয় বিষয় যা অন্য কোনো সময়ের সাথে নেই। তাই আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বিশেষভাবে বান্দাকে তার যৌবনকাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। কোথায় সে তা ব্যয় করেছে? প্রতিটি সময়ের হিসাব তিনি জিজ্ঞেস করবেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারপাশে নক্ষত্রের মতো যারা সর্বদা ভিড় করতেন তারা হলেন উম্মাহর যুবক শ্রেণি। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা ছিলেন তরুণ ও যুবক সর্বদা তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারপাশে অবস্থান করতেন। এই দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সোনালি যুগের সে-সমস্ত যুবকদের রক্ত ও শ্রমে। যুবকদের অপরিসীম ত্যাগের ফলে ইসলাম পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। যুবকদের সাহস ও বীরত্বে ইসলাম ছড়িয়েছে দুনিয়ার আনাচে-কানাচে।

কিন্তু কারা সেসব যুবক যাদের মাধ্যমে ইসলাম পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? কারা তারা যাদের রক্ত ও ঘামে ঈমানের আলো ছড়িয়েছে পৃথিবীব্যাপী? তারা হলো ওইসব যুবক যারা আল্লাহর কুরআন এবং রাসুল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করেছে। তারা হলো ওইসব যুবক, যারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করেছে। যারা নিজেদের জীবন পরিচালনা করেছে ইসলামের রীতিনীতি অনুযায়ী। আল্লাহর আনুগত্য করেছে। বিরত থেকে নাফরমানি ও অবাধ্যতা থেকে। যারা সৎকাজের আদেশ করেছে এবং নিষেধ করেছে অন্যায় ও মন্দ কাজ থেকে।

সৎ ব্যক্তিদের সংস্পর্শ

যুবকদের সংশোধন ও আত্মশুদ্ধির জন্য সর্বাধিক প্রয়োজনীয় হলো সৎ, নেককার ও আল্লাহওয়ালা লোকদের সংস্পর্শ। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার প্রিয় বান্দাদের সান্নিধ্যের সৌরভে স্নিগ্ধ হওয়া। তাদের সুবাসে সুবাসিত হওয়া। সেই সাথে খারাপ ও মন্দ লোকদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা। আল্লাহর নেককার বান্দাদের সংস্পর্শে যুবকদের অন্তর আলোকিত হবে। তারা ফিরে আসবে অবাধ্যতা ও নাফরমানি থেকে। যুব প্রজন্মের ইসলাহ ও সংশোধনের জন্য প্রথম করণীয় হলো, সৎ ও নেককার লোকদের সংস্পর্শে আসা এবং মন্দ লোকদের সংস্পর্শ থেকে বিরত থাকা। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا

'যেদিন অন্যায়কারী নিজের দুই হাত কামড়াবে আর বলবে, হায়! আমি যদি রাসুলের সাথে একটি পথ গ্রহণ করতাম। হায়! আমার দুর্ভোগ, আমি যদি অমুককে আমার বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। আমার কাছে উপদেশ আসার পর সে-ই

তো আমাকে বিপথে নিয়েছিল। আর শয়তান সব সময় মানুষকে বিপদকালে ধোঁকা দিয়ে থাকে।[৬৭]

যৌবনকাল হলো মানুষের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ সময়। এ সময় মানুষ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে থাকে। যা খুশি তাই করতে ইচ্ছে করে। হিতাহিত জ্ঞান থাকে না তখন। ভালো-মন্দের যাচাই করার সময় হয় না। শক্তি থাকে দ্বিগুণ। সাহস থাকে প্রচণ্ড। শরীরের রক্ত থাকে গরম। কোনো শক্তিই তাকে ফেরাতে পারে না। অদম্য ইচ্ছের সামনে সবকিছু ভেসে যায় বানের স্রোতের মত। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই যৌবনকাল সম্পর্কে অধিক সতর্ক করেছেন। যৌবনকালের ইবাদত আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার নিকট অতি মূল্যবান। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদিসে ইরশাদ করেছেন, সাত প্রকার ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন আরশের ছায়ার নিচে আশ্রয় দেবেন। তন্মধ্যে এক প্রকার হলো, ঐ যুবক, যে তার যৌবনকাল আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতে কাটিয়েছে। পক্ষান্তরে যৌবনকালে মানুষ অধিক অবাধ্যতা নাফরমানি করে থাকে। এ সময় প্রবৃত্তির অনুসরণ তাকে তাড়িত করে। হৃদয় মন অনেক কিছুই করতে চায়। ভালো ও মন্দের পার্থক্য করার জ্ঞান থাকে না। তাই যৌবনকালে অবাধ্যতা ও নাফরমানি থেকে বিরত থাকতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। কেয়ামতের দিন আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বান্দার সমগ্র জীবনের হিসাব গ্রহণ তো করবেন-ই। বিশেষভাবে যৌবনকালের হিসাব গ্রহণ করবেন।

---

৬৭ সুরা ফুরকান: ২৭-২৯

নীড়ে ফেরার গল্প

একবার আমি জরুরি কাজে কয়েক মাসের জন্য বিদেশ যাই। আমার সাথে ছিল আরো একজন। বয়সে যুবক। তারুণ্যের অপরিসীম উচ্ছ্বাস তার হৃদয়ে উপচে পড়ছে। আমি তাকে চিনি না এবং তার সম্পর্কে কিছুই জানি না। ইতিপূর্বে তার সঙ্গে কখনো আমার দেখা হয়নি। সেখানে আমাদের একসাথে থাকতে দেওয়া হলো। কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত আমাদের একসাথে থাকতে হবে। একসাথে ঘুম থেকে পানাহার সবকিছুই। সে এসেছে জেদ্দা থেকে, আমি দাহরান থেকে। প্রথমে তার সঙ্গে থাকতে আমি অনেকটা ইতস্তত বোধ করছিলাম। মনে হলো, সেও আমার সঙ্গে স্বাভাবিক হতে পারছে না। তাছাড়া আমরা দুজন ছিলাম দুই মেরুর মানুষ। আমাদের পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন। আচার-স্বভাব কিছুতেই মিল ছিল না। আমি ভাবতে লাগলাম, কীভাবে এ ক-টি মাস কাটবে এখানে আমার। সেও তেমনটিই ভাবছিল। আমার কাছে মনে হচ্ছিল, হয়তো সে আমার দ্বারা প্রভাবিত হবে, অথবা আমি তার দ্বারা প্রভাবিত হবো। কিন্তু আমি জানি, সর্বদা সত্যই বিজয়ী হয়। সত্যের দ্বারা মিথ্যা প্রভাবিত হয়। সত্য সর্বদা সুদৃঢ় থাকে। এমনটি ভেবে আমি সান্ত্বনা অনুভব করলাম।

আমি সব সময় মসজিদে নামাজ পড়ে অভ্যস্ত। আজান হলে নিয়মিত মসজিদে চলে যাই। যতদিন সেখানে অবস্থান করব, মনস্থির করি মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামাজ পড়ব। আর মসজিদ ছিল নিকটেই। যদিও আমাদের হোটেলেই নামাজের ব্যবস্থা রয়েছে। আমি দেখেছি, প্রায় সকল হোটেল এবং অফিসেই এখন নামাজের ব্যবস্থা রয়েছে। তারা পারতপক্ষে মসজিদে যায় না। নিজেদের কর্মস্থলেই নামাজ আদায় করে নেয়। বিষয়টি আমার নিকট অত্যন্ত দুঃখজনক বলে মনে হলো। মসজিদে নামাজ আদায়ের বিশেষ ফজিলত রয়েছে। ওই কদমের চেয়ে উত্তম আর কোন কদম কী হতে পারে, যা মসজিদে গমনের জন্য হয়ে থাকে !? প্রতিটি কদমের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বান্দাকে একটি নেকি দান করেন এবং একটি গোনাহ মোচন করেন। পায়ে হেঁটে যদি মসজিদেই যেতে না পারে মানুষ তাহলে সে পায়ের মূল্যই-বা কী? যে পা আল্লাহর ঘর মসজিদে গমনের জন্য ব্যবহৃত হয় না সে পায়ের আর কী মূল্য রয়েছে?

নামাজের সময় ঘনিয়ে এলো। এখানে আসার পর এটি ছিল আমাদের প্রথম নামাজ। আমি আমার সঙ্গের লোকটিকে বললাম, চলো, আমরা মসজিদে যাই এবং জামাতের সাথে নামাজ আদায় করি। সে আমার কথা শোনে আশ্চর্যবোধ করল এবং বলল, এখানেই তো নামাজের ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা সকলে হোটেলেই নামাজ পড়ব। আমি বললাম, না, আমি মসজিদে নামাজ পড়ব। আর মসজিদ তো নিকটেই। একশ কিংবা দুইশ মিটারের বেশি হবে না। এতটুকুন পথ পায়ে হেঁটে যেতে সমস্যা হবে না। কেয়ামতের দিন তুমি এর মূল্য দেখতে পারবে আমলের পাল্লায়। প্রতিটি পদক্ষেপে একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং একটি করে গোনাহ মোচন হবে। কল্যাণের দিকে প্রতিটি পদক্ষেপের মূল্য আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে দেবেন। ইরশাদ করেন,

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

'অতঃপর তাদের প্রভু তাদের দোয়া কবুল করে বলেন, তোমাদের কারো কাজ আমি নষ্ট করি না, সে পুরুষ হোক অথবা নারী। তোমরা একে অপরের অংশ।'[৬৮]

সুবহানাল্লাহ! এরপর লোকটি আমার সাথে মসজিদে যেতে লাগল। প্রতি ওয়াক্ত নামাজ আমার সাথে মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে আদায় করতে লাগল। এমনকি ফজরের নামাজও। আমি আশ্চর্য হলাম এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। আমার ধারণাই সত্য হলো, হক কখনো মিথ্যার দ্বারা প্রভাবিত হয় না, বরং হকের দ্বারা সকলে প্রভাবিত হয়। লোকটি ধীরে ধীরে পরিবর্তন হতে থাকে। যার জন্য একদা ফজরের সময় ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া ছিল অত্যন্ত কঠিন, এখন তা হয়ে গেল খুবই সহজ। কখনো দেখি, আমার পূর্বে সে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে আমার অপেক্ষা করছে। এক নতুন জীবনে পদার্পণ করেছে সে। তার জীবনে উদিত হয়েছে এক নতুন ভোর। সত্যিই, পরিবর্তন হলো নিজের কাছে। যে নিজেকে পরিবর্তন করতে চায়, আল্লাহ তাকে পরিবর্তন করেন। উপযুক্ত পরিবেশ ও সুযোগ তৈরি করে

---

৬৮ সুরা আলে ইমরান: ১৯৫

দেন। যে আমল করতে চায় আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তার জন্য আমলকে সহজ করে দেন। সবকিছু তার অনুকূল করে দেন।

লোকটি নিয়মিত আমার সাথে মসজিদে যেতে লাগল। তার মনোজগৎ সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। হে আল্লাহর বান্দা! মসজিদই প্রকৃত হেদায়েতের উৎস। যে হেদায়েতের সাথে মসজিদ সম্পৃক্ত সেটিই প্রকৃত হেদায়েত। যে হেদায়েত মসজিদের সাথে অন্তরকে সম্পৃক্ত করে সে হেদায়েত আল্লাহর পক্ষ থেকে। পক্ষান্তরে যা মসজিদ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় তা কখনো প্রকৃত হেদায়েত নয়। তা মিথ্যা। তা সত্যের নামে প্রতারণা। তার ওপর আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার লানত ও অভিশাপ।

তখন সময়টি ছিল রমজান পরবর্তী শাওয়াল মাস। যে মাসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত ছয়টি রোজা পালন করতেন। যার ব্যাপারে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে প্রভূত ফজিলত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر

'যে ব্যক্তি রমজানের রোজা এবং পরবর্তী শাওয়াল মাসের ছয়টি রোজা রেখেছে সে যেন পূর্ণ বছর রোজা রেখেছে।'[৬৯]

এ ছয়টি রোজা অনেকের নিকট কঠিন মনে হয়। যেহেতু মাত্রই পূর্ণ এক মাস রমজানের রোজা রেখেছে তাই নতুন করে আরো ছয়টি রোজা তাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য মনে হয়। কিন্তু এর রয়েছে অনেক ফজিলত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত শাওয়ালের ছয় রোজা রাখতেন। এবং এটি ছিল তার নিকট অত্যন্ত প্রিয় আমল।

আমি আমার সঙ্গের যুবকটিকে বললাম, যেন সেও আমার সাথে শাওয়ালের রোজা রাখে। আমার কথায় যুবকটি ভারি আশ্চর্যবোধ করল এবং বলল, আপনি আমাকে হোটেল থেকে মসজিদে নিয়েছেন, ফজরের সালাতে উঠতে বাধ্য করেছেন আর এখন বলছেন নফল রোজা রাখতে?

আমি তাকে বললাম, তুমি কি রমজানের সবগুলো রোজা রেখেছ? সে বলল, হ্যাঁ।

---

৬৯ *সহিহ মুসলিম:* ১১৬৪

আমি বললাম, তাহলে এখন শাওয়ালের ছয়টি রোজা রাখতে ভয় করছ কেন? কোন জিনিস তোমাকে এ ফজিলত লাভ করা থেকে বিরত রাখছে? যে ব্যক্তি শাওয়ালের ছয় রোজার ফজিলত সম্পর্কে জানে তার জন্য উচিত নয় এর থেকে বঞ্চিত হওয়া।

সুবহানাল্লাহ! আমার সামান্য কথায় তার হৃদয়ে পরিবর্তন এলো। পরদিন থেকে সে আমার সাথে রোজা রাখতে আরম্ভ করল। কল্পনা করুন আমার সঙ্গী সে যুবকের অবস্থা। সে প্রতিদিন ফজরের পূর্বে ঘুম থেকে জাগ্রত হচ্ছে, রোজার প্রস্তুতির জন্য সাহরি খাচ্ছে। সাহরি শেষে কুরআন তিলাওয়াতের চেষ্টা করছে। কিছুক্ষণ বাদে মসজিদ থেকে ফজরের আজান ভেসে আসছে। আজান শোনে নামাজের জন্য মসজিদের দিকে রওনা হচ্ছে। এভাবেই কাটতে লাগল তার দিনগুলো।

আমরা পাঁচটি রোজা পূর্ণ করলাম। আর মাত্র একটি রোজা বাকি রয়েছে। এমন সময় একটি জরুরি কাজে আমাদের জেদ্দায় যেতে হলো। আমি আমার সঙ্গী যুবককে বললাম, এখনো আমাদের আরো একটি রোজা অবশিষ্ট রয়েছে। ইনশাআল্লাহ, জেদ্দা থেকে ফিরে এসে বাকি রোজা রাখব। যথারীতি কাজ শেষ করে আমরা ফিরে আসি আমাদের হোটেলে। যুবকই আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলো এবং বলল, হে শাইখ! আমাদের একটি রোজা এখানে অবশিষ্ট রয়েছে। আমি তার কথা শোনে দ্বিগুণ আনন্দিত হলাম।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

> 'আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন না করে।'[৭০]

আরো আশ্চর্য এই যে, কিছুদিন পর আমি তার হাতে একটি চিরুনি দেখতে পেলাম। তা দিয়ে সে তার থুতনির আঁচড় কাটছে। অথচ তার দাড়ি তখনো তেমন প্রকাশিত হয়নি, যাতে চিরুনি ব্যবহার করা যায়। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার! তোমার হাতে চিরুনি কেন? সে আমাকে বিস্মিত করে বলল, আমার আশার চেয়েও তা ছিল অধিক কিছু। যুবকটি

---

৭০ সুরা রাদ: ১১

বলল, কিছুদিন পর আমার মুখমণ্ডলে দাড়ি উঠবে এবং আপনার দাড়ির মতোই সুন্দর দেখাবে। এ বলে সে হাসতে লাগল। ওই সত্তার শপথ যিনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে বের করে আনেন! আমার হৃদয় তখন আনন্দে ভরে উঠল। কায়মনোবাক্যে আমি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করলাম। আর ভাবতে লাগলাম, তার পরিবর্তনের কথা। কিছুদিন পূর্বেও যে ছিল উদাসীন আজ সে দ্বীনের ব্যাপারে কত সচেতন। নিজেকে প্রতিনিয়ত সে পরিবর্তন করছে। বস্তুত যে নিজেকে পরিবর্তন করতে চায়, আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাকে পরিবর্তন করার সুযোগ তৈরি করে দেন। তার অন্তরকে হেদায়েতের জন্য প্রশস্ত করে দেন। আনুগত্যকে করে দেন সহজ। অবাধ্যতা ও নাফরমানিকে বানিয়ে দেন কঠিন ও দুর্বোধ্য। মানুষ যখন আজ তার দ্বীনের ব্যাপারে অতি উদাসীন। আল্লাহর অবাধ্যতা ও নাফরমানির মাঝে অতিবাহিত করছে দিনরাত। তখন আমার সঙ্গীটি প্রতিনিয়ত দ্বীনের নতুন নতুন বিষয় শিখছে।

একদিন সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, রুকুতে গিয়ে কী দোয়া করবে? সিজদায় কী বলে প্রার্থনা করবে আল্লাহর নিকট? আমি তাকে দারুণ আগ্রহের সাথে সবকিছু শিখিয়ে দিতে থাকি। আমাদের দিন যত যেতে লাগল, ততই সে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় শিখতে লাগল। অন্যরা নামাজের পর চলে যায়। কিন্তু আমার সঙ্গী যুবকটি জায়নামাজে বসে থাকে। হিসনুল মুসলিম নামক দোয়ার একটি বই খুলে যেখানে সকাল-সন্ধ্যার বিভিন্ন দোয়া ও জিকির বর্ণিত রয়েছে। বইটি খুলে সে প্রতি নামাজের পর সে-সমস্ত দোয়া পড়তে থাকে। একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর জিকির করে। দীর্ঘ মুনাজাত করে। চোখের অশ্রুতে কখনো তার বুক ভেসে যায়। দূর থেকে আমি এ আনন্দদায়ক দৃশ্য দেখে আল্লাহকে স্মরণ করি। তার শুকরিয়া জ্ঞাপন করি। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ .

'তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব।'[৭১]

أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب

---

[৭১] সুরা বাকারা: ১৫২

'জেনে রেখো! আল্লাহর জিকির দ্বারা অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।'[৭২]

আমার সঙ্গী সে যুবক এক নতুন জীবন শুরু করল। পূর্বের জীবনের সাথে যার কোনো সাদৃশ্য নেই। আগে সে ফজরের সময় থাকত ঘুমে বিভোর, এখন মুয়াজ্জিনের আজান শোনামাত্র তার ঘুম ভেঙে যায়। বিছানা ছেড়ে মসজিদের দিকে ছুটতে থাকে। আগে তার মুখে ছিল না দাড়ি, এখন সুন্দর দাড়িতে তার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ও আলোকিত। আগে তার হৃদয় ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন, এখন তার হৃদয়ে আল্লাহর হেদায়েতের নূরে পরিপূর্ণ।

একদিন সে আমাকে বলল, একদিন আমি ছিলাম মৃত, এখন আল্লাহ তায়ালা আমাকে নতুন জীবন দান করেছেন। আমার জীবনের তখন কোনো মূল্য ছিল না। ছিলাম চতুষ্পদ জন্তুর মতো। বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট। সূর্যোদয়ের ঢের পর ঘুম থেকে উঠে কাজে যেতাম, ফিরতাম দুপুর দুইটায়। আমার জীবনে ছিল না আল্লাহর আনুগত্য। নামাজ পড়তাম না। রোজা রাখতাম না। গোনাহ ও পাপাচারে লিপ্ত ছিলাম। চোখের হেফাজত করতাম না। কান দিয়ে গান শুনতাম। সকল প্রকার নাফরমানি ও অবাধ্যতায় ভরপুর ছিল আমার জীবন। সে জীবনের কোনো মূল্যই ছিল না। প্রবৃত্তির অনুসরণ করতাম। মনে যা চাইত তাই করতাম তখন।'
আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন,

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

'তুমি কি দেখেছ তাকে যে তার উপাস্য বানিয়েছে নিজের প্রবৃত্তিকে? তবুও কি তুমি তার জিম্মাদার হবে? নাকি তুমি মনে করো, তাদরে অধিকাংশ শোনে কিংবা বোঝে? তারা আসলে পশুদের মতোই, বরং তার চেয়েও অধিক পথভ্রষ্ট।'[৭৩]

---

৭২ সুরা রাদ: ২৮
৭৩ সুরা ফুরকান: ৪৩-৪৪

সে বলতে লাগল, কিন্তু এখানে আপনি আমার সঙ্গী হলেন। আপনি আমাকে মসজিদে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমি কাতারবদ্ধ হয়ে জামাতের সাথে নামাজ পড়তে শুরু করি। আমি গানবাদ্য শুনতাম, কিন্তু আপনি আমার গানকে কুরআন দ্বারা পরিবর্তন করে দিলেন। প্রতিনিয়ত আপনি আমাকে দ্বীনের নতুন নতুন বিষয় শিক্ষা দিতে লাগলেন। আমার হৃদয়ে ঈমান শক্ত হতে লাগল। আল্লাহ আমাকে হেদায়েতের আলো দ্বারা সিক্ত করলেন। আপনার সঙ্গ আমাকে নতুন জীবন দান করেছে।'

বস্তুত হেদায়েত ব্যতীত মানুষ মৃত ব্যক্তির তুল্য। যার অন্তরে হেদায়েত নেই তার কোনো মূল্য নেই। মৃত ব্যক্তির এতই মূল্যহীন। মৃত ও জীবিত কখনো বরাবর নয়। যার অন্তরে ঈমান নেই সে তো অন্ধ। অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কখনো সমান নয়। যার অন্তরে হেদায়েত নেই সে অন্ধকার। অন্ধকার ও আলো কখনো সমান নয়। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন,

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ
كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا

> 'যে ব্যক্তি মৃত ছিল, আমি তাকে জীবিত করেছি এবং একটি আলো দান করেছি যার সাহায্যে সে মানুষের মধ্যে চলতে পারে, সে কি ওই ব্যক্তির মতো হতে পারে, যে অন্ধকারের মধ্যে আছে এবং সেখান থেকে বের হচ্ছে না?'[৭৪]

হে আমার প্রিয় যুবক ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেককে আকল তথা জ্ঞান দান করেছেন। এটি আল্লাহ তায়ালার একটি অতি বড় নেয়ামত। এ জ্ঞান তিনি কেবল মানুষকেই দান করেছেন। যেন মানুষ চিনতে পারে কোনটি সত্য এবং কোনটি মিথ্যা। যেন মানুষ জানতে পারে, কোনটি তার জন্য কল্যাণকর এবং কোনটি তার জন্য ক্ষতিকর। তাই আমাদের উচিত, আল্লাহ তায়ালা আমাদের যে জ্ঞান দান করেছেন তা প্রয়োগ করে নিজেদের অবস্থা যাচাই করা। আমি যা কিছু করছি, তা কি কল্যাণকর নাকি অকল্যাণকর? তা আমার উপকারে আসবে নাকি ক্ষতি করবে? হে আমার প্রিয় যুবক ভাইয়েরা! নিজেদের জিজ্ঞেস করো, তুমি কী করছ, আর কী করা উচিত ছিল। জেনে রেখো! যে নিজেকে পরিবর্তন করতে চায়, আল্লাহ

৭৪সুরা আনআম: ১২২

তায়ালা তাকে পরিবর্তন করেন। আর যে নিজেকে পরিবর্তন করতে চায় না, তাকে তার আপন অবস্থার ওপর রেখে দেন। তাই হে যুবক! নিজেকে পরিবর্তন করো। ফিরে এসো রবের দিকে। ফিরে এসো প্রকৃত কল্যাণের পথে। নাফরমানিকে আনুগত্যে রূপান্তরিত করো। গোনাহকে আমলে পরিণত করো। তুমি আল্লাহর হয়ে যাও। তাহলে দেখবে, আল্লাহ তোমার হয়ে গেছেন।

আত্মশুদ্ধির গল্প

এমন কতিপয় কুরআনুল কারিমের আয়াত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস এবং আল্লাহর পুণ্যবান বান্দাদের কিছু চিত্তাকর্ষক গল্প আমি বর্ণনা করব, যা তোমাদের হৃদয়-নদীতে চিন্তার ঝড় তুলবে। তোমাদের মন ও মননে শুদ্ধতার সবুজ বাতাস প্রবাহিত করবে। ওই সকল বিশেষ বান্দাদের গল্প যাদের আত্মিক সম্পর্ক আসমানের সাথে। যাদের হৃদয়ের বন্ধন আরশের অধিপতির সাথে। বৈষয়িক সাধারণ তুচ্ছ বিষয়ের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

'তোমাদের প্রতিশ্রুত রিজিক তো আসমানে।'[৭৫]

ওইসব বিশেষ বান্দাদের গল্প, যারা জমিনে বিচরণ করলেও তাদের পদধ্বনি শোনা যায় আসমানে। তাদের কদম জমিনে থাকলেও হৃদয় থাকে আল্লাহর সান্নিধ্য ও পরকালের চিন্তায় বিভোর। আল্লাহ তায়ালার সাথে তাদের সম্পর্ক অতি বিশেষ। মূলত তারাই আল্লাহর প্রকৃত বান্দা।

---

৭৫ সুরা যারিয়াত: ২২

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا * وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا * وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا .

'রহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং মূর্খরা যখন তাদের সম্বোধন করে তখন তারা বলে সালাম। যারা তাদের প্রভুর উদ্দেশ্যে সিজদারত ও দণ্ডায়মান অবস্থায় রাত অতিবাহিত করে। যারা বলে হে আমাদের প্রভু! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তিকে দূরে রাখুন। নিশ্চয় জাহান্নামের শাস্তি বড় সর্বনাশা।'[৭৬]

ওইসব মনোনীত বান্দাদের গল্প শোনাব যারা আল্লাহ তায়ালার নিকট অত্যধিক প্রিয়। দুনিয়ার ভোগবিলাস এবং এর তুচ্ছ জিনিসের প্রতি তাদের নেই কোনো মোহ। তাদের হৃদয় সদা ব্যস্ত থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনে। তারা তাই করেন যা আল্লাহ চান। আর যা চান না তা থেকে বিরত থাকেন। তাদের স্বপ্ন ও আরাধ্য হলো ওইসকল বস্তু আল্লাহ তায়ালা যা প্রস্তুত করে রেখেছেন তাদের জন্য।

আবদুল ওহায়েদ ইবনে যিয়াদ সেসব পুণ্যবান ব্যক্তিদের একজন আল্লাহ তায়ালা যাদের তার প্রিয় বান্দা হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যিয়াদ বলেন, আমরা প্রায়শই আমাদের মজলিসে আল্লাহর রাস্তায় শহিদ হওয়ার ফজিলত নিয়ে আলোচনা করতাম। আল্লাহ তায়ালার নিকট শহিদদের অতুলনীয় মর্যাদার কথা আলোচনা করতাম। আল্লাহ তায়ালা তার রাহে শহিদ হওয়া বান্দাদের সুউচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। তাদের দিয়েছেন বিশেষ সম্মানের আসন। এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের দিয়েছেন এক বিশেষ প্রতিশ্রুতি। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহিদদের ফজিলত ও মর্যাদা বর্ণনা করে ইরশাদ করেন,

---

৭৬ সুরা ফুরকান: ৬৩-৬৫

إن للشهداء في سبيل الله مائة درجة في الجنة

'আল্লাহর রাস্তায় শহিদদের জন্য বেহেশতে রয়েছে একশ মর্যাদা।'

সুতরাং চিন্তা করে দেখো! আল্লাহ তায়ালা তাদের কত বড় মর্যাদা দান করেছেন। যে মর্যাদার সাথে অন্য কোনো মর্যাদার কোনো প্রকার তুলনা হতে পারে না। এ বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে কেবল শহিদদের যারা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জীবন উৎসর্গ করবে। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন। আর বিনিময়স্বরূপ তাদের দিয়েছেন জান্নাতের প্রতিশ্রুতি।

পবিত্র কুরআনে তাদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

'আল্লাহ তো মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন। মূল্য হিসেবে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।[৭৭]

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

'আল্লাহর চেয়ে বড় ওয়াদা পূরণকারী আর কে আছে? অতএব তোমরা যে বিক্রয় সম্পন্ন করেছ তাতে সন্তুষ্ট থাকো। এটিই বড় সাফল্য।'[৭৮]

আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যিয়াদ বলেন, এ কথা শুনে মজলিসে উপস্থিত এক ষোল বছরের বালক দাঁড়িয়ে বলল, হে আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যিয়াদ!

---

৭৭ সুরা তাওবা: ১১১

৭৮ সুরা তাওবা: ১১১

সত্যিই কি আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে আমাদের জান ও মাল কিনে নিয়েছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে আমাদের জান ও মাল কিনে নিয়েছেন। এ কথা শুনে উক্ত বালক অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলল, আমি একজন ইয়াতিম। পিতা-মাতা আমার জন্য অঢেল সম্পদ রেখে গিয়েছেন। ওয়ারিসসূত্রে প্রাপ্ত সে-সমস্ত সম্পদ এবং আমার জীবনের বিনিময়ে আল্লাহর নিকট থেকে আমি জান্নাত ক্রয় করতে চাই। আমার জান ও মাল একমাত্র আল্লাহর জন্য বিলীন করে দিতে চাই। আর বিনিময়ে আমি চাই আমার রবের প্রতিশ্রুত জান্নাত।

হে মুসলিম যুব ও তরুণ প্রজন্ম! দেখো! এক ষোল বছরের বালক কী বলছে। হে যুবক! শোনো কী বলছে সে তরুণ। তার সাহস ও উদ্দীপনার পারদ কত! তার বয়স সবে ষোল কিন্তু তার কাজ প্রাপ্তবয়স্ক ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের চেয়েও অধিক। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আজ ষোল বছরের ছেলেদের বলা হচ্ছে ওরা কিশোর এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক। তাদের বড়দের কাতারে গণ্যই করা হচ্ছে না। তাদের মনে করা হচ্ছে অবুঝ ও কর্মে অক্ষম। তাদের অপরাধকে অপরাধ গণ্য করা হচ্ছে না। তাদের শাস্তির উপযুক্ত মনে করা হচ্ছে না। তাদের আল্লাহর আদেশসমূহ পালনের জন্য উপযুক্ত জ্ঞান করা হচ্ছে না। মসজিদের মিনার থেকে ফজরের আজান ভেসে আসে তখন তাদের ছোট বলে ঘুম থেকে জাগ্রত করা হয় না। হারাম ও নাজায়েজ কাজ থেকে কেউ তাদের নিবৃত করে না। ভাবছে, তারা তো এখনো দ্বীন পালনের জন্য উপযুক্তই হয়নি। অথচ ইসলামের নিকট ও দূর অতীতে এমন কোনো প্রচলন ছিল না। ষোল বছর পেরিয়ে গেলেও আজ তাদের শরিয়তের বিধানাবলির উপযুক্ত গণ্য করা হচ্ছে না। তাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক বলে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। তাদের উপর শরিয়তের বিধানাবালি প্রয়োগ করা হচ্ছে না। হে মুসলমান! জেনে রেখো! সূচনাতেই ইসলামের শক্তিকে নড়বড়ে করে দেওয়ার এ এক পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র। প্রত্যেক জাতির প্রাণশক্তি হলো তরুণ ও যুব সমাজ। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর তরুণদের সঠিক পথ থেকে অঙ্কুরেই বিচ্যুত করে দিচ্ছে। ইসলামের শত্রুদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দিয়ে মুসলমান পিতা-মাতাগণ তাদের সন্তানদের হৃদয় থেকে কচিকালেই ইসলামের সৌন্দর্য ধ্বংস করে দিচ্ছে। ইসলামের দৃষ্টিতে তারা প্রাপ্তবয়স্ক এবং শরিয়তের বিধি-বিধান পালনের উপযুক্ত সাব্যস্ত হলেও

পাশ্চাত্য সভ্যতার গড্ডলিকাপ্রবাহে গা ভাসিয়ে সন্তানদের তারা ছোট ও অপ্রাপ্তবয়স্ক বলে ইসলামের বিধিবিধান পালন থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে।

অতঃপর আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যিয়াদ বলেন, ষোল বছরের সে ছেলেটি ফের আমাকে জিজ্ঞেস করল একই কথা। আমিও দৃঢ়তার সাথে তাকে জবাব দিলাম। পুনরায় সে তার জান ও সমুধয় মাল দিয়ে আল্লাহর নিকট থেকে জান্নাত ক্রয়ের শক্ত অভিপ্রায় ব্যক্ত করল। সে জিহাদে যেতে চাইল এবং আল্লাহর রাস্তায় শহিদ হয়ে বিশেষ ফজিলত লাভ করতে প্রচণ্ড আগ্রহী হলো। কিন্তু আমি তাকে বললাম, তুমি তো বয়সে ছোট। যুদ্ধের ময়দানে তরবারির বিভৎস ধ্বনি শোনে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে এবং শত্রুর ভয়ে পালিয়ে আসবে। আমার কথা শুনে ছেলেটি বলল, যদি অস্ত্রের ঝনঝনানি শুনে রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে আসি তাহলে আমার চেয়ে দুর্ভাগ্যবান আর কেউ নেই, অথচ আমার বক্ষে রয়েছে আল্লাহর কিতাব। দুশমনের শানিত তরবারির ঝলক দেখে আল্লাহর শপথ আমি ভীত হবো না। মৃত্যুভয়ে কখনো পালিয়ে আসব না রণাঙ্গন থেকে।

আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যিয়াদ বলেন, পরদিন ভোরে সকলের আগে সে তার সমুদয় মাল নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। কেউ তার পূর্বে জান ও মাল নিয়ে উপস্থিত হতে পারেনি। আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের জান ও মাল কিনে নিয়েছেন শোনার পর তার হৃদয়ে শাহাদতের যে জ্বলন ও স্পৃহা প্রজ্বলিত হয়েছে তা সত্যিই অবাক ও বিমুগ্ধ করেছে আমাদের। তার সাহস ও উদ্দীপনা দেখে যারপরনাই আমরা প্রফুল্ল হয়েছি। সমস্ত মাল আমার সামনে রেখে বলল, 'হে আবদুল ওয়াহেদ! গ্রহণ করুন আমার সমস্ত মাল। খরচ করুন আল্লাহর রাস্তায় নিয়োজিত মুজাহিদদের পেছনে। এবং আমাকেও তাদের সেবায় সাদরে গ্রহণ করুন। আমি আমার জান ও মাল সম্পূর্ণ আল্লাহর রাস্তায় মিটিয়ে দিতে চাই। এখন আমার নিকট আমার রবের প্রতিশ্রুত জান্নাতের চেয়ে আর কিছুই প্রিয় নয়।'

যুদ্ধের পুরো সফরে সে মুজাহিদদের সীমাহীন খেদমত করেছে। বড়দের সম্মানে পূর্ণ ছিল তার হৃদয়। ছোটদের প্রতি ছিল অসম্ভব স্নেহ। আমিরের নির্দেশের প্রতি ছিল অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণ। আল্লাহু আকবার! কে লালন-পালন করেছে এই ইয়াতিম ছেলেকে। কে তাকে এত সাহসী করে তুলেছে। হ্যাঁ, কুরআন তাকে লালন-পালন করেছে। সে ছিল কুরআনের হাফিজ। তার চিত্তকে প্রসারিত ও বিমোহিত করেছে পবিত্র কুরআনের পরশ। শৈশব

থেকেই কুরআনের সাথে ছিল তার নিবিড় সম্পর্ক। জীবনের সূচনাতেই সে নিজেকে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যে সমর্পণ করেছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর সান্নিধ্যে বেড়ে উঠেছে তার শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের প্রারম্ভ। আর সেজন্যই ইসলামের জন্য সর্বস্ব উজাড় করে দেওয়ার মানসিকতা গড়ে উঠেছে তার অন্তরে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আজ মুসলমানদের সন্তানরা জন্ম থেকেই বেড়ে উঠছে অবাধ্যতা ও নাফরমানির ভেতর। শৈশব থেকে তাদের ইসলামের শাশ্বত রূপ ও সৌন্দর্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হচ্ছে। ছোট বলে তাদের শেখানো হচ্ছে না ইসলামের মৌলিক শিক্ষা। অপ্রাপ্তবয়স্ক বলে তাদের আল্লাহ তায়ালার বিধি-বিধান পালন থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে পিতা-মাতা। শারীরিক ও মানসিক বিকার হবে বলে সকালে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিচ্ছে না নামাজ ও কুরআন পাঠের জন্য। অপুষ্টি ও ঘুমের অজুহাত দিয়ে পিতা-মাতা নিজ সন্তানদের নামাজের জন্য প্রস্তুত করছে না। ফলে শৈশব থেকে তারা ইসলামের আলো-ছায়া থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

তাদের বানানো পরিভাষায় যখন তাদের সন্তানরা প্রাপ্তবয়স্কে পৌঁছে তখন তাদের হৃদয় ইসলামের বর্ণিল ও ভুবনজয়ী চেতনাকে ধারণ করতে সক্ষম হয় না। এভাবেই চেতনাহীন একটি প্রজন্ম গড়ে উঠছে মুসলিম উম্মাহর। তাদের নাম পরিচয় মুসলমান থাকলেও তাদের হৃদয়ে নেই ইসলামের সৌন্দর্য। চিন্তা-চেতনায় তারা পাশ্চাত্যের গোলামিপনায় বন্দি। আল্লাহর রাস্তায় নিয়োজিত মুজাহিদরা যাদের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে, তারা সে শত্রুদের চিন্তা-চেতনা, শিক্ষা-দীক্ষায় লালিত হচ্ছে।

আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যিয়াদ বলেন, 'তারপর যুদ্ধের সময় ঘনিয়ে এলো। শত্রুপক্ষ অদূরে তাদের শিবির স্থাপন করেছে। আমরা আমাদের যুদ্ধের সারি প্রস্তুত করলাম। ষোল বছরের তরুণটি ছিল সর্বাগ্রে। একটি ঘোড়ার ওপর আরোহন করে সে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল। সীমাহীন সাহস এবং প্রচণ্ড শক্তিতে শত্রুদের বিরুদ্ধে সে লড়ে যাচ্ছিল।

আমাদের সে যুদ্ধ ছিল দীর্ঘস্থায়ী। সমগ্র দিন যুদ্ধ করে আমরা রণাঙ্গনেই তাবু স্থাপন করে রাত্রিযাপন করতাম। সে দিনগুলো ছিল আমাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টের। এক ঘোর বিপদ নেমে এসেছিল আমাদের ওপর। মুজাহিদগণ রাতভর নামাজে দাঁড়িয়ে থাকতেন। দীর্ঘ মুনাজাতে কান্নাকাটি করতেন। আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতেন। রাতের খুব অল্প সময়ই তারা

ঘুমাতেন। এক সকালে ছেলেটি আমার নিকট এলো। তাকে সেদিন ভারি উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। তার চোখে-মুখে ছিল খুশির আভা। কিছুক্ষণ চুপ থেকে সে বলতে শুরু করল। 'কাল রাতে আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি। এ স্বপ্নের কথা আপনি কাউকে বলবেন না, যতক্ষণ না আমি শাহাদতের পেয়ালা পান করি। ছেলেটি বলল, স্বপ্নে দেখি আমি বেহেশতের একটি বাগানে প্রবেশ করেছি। অগণিত ও অফুরন্ত সুন্দর সব হুর সেখানে বিচরণ করছে। তাদের চোখ ছিল ডাগর ডাগর। তাদের কেশ ছিল ঘনকালো। তাদের বাহু ছিল দীর্ঘ ও বিস্তৃত। তাদের গলা সরু ও দীঘল। তাদের দেহ থেকে ছড়াচ্ছিল অনির্বচনীয় সুবাস। পৃথিবীর কোনো চোখ কখনো তা দেখেনি। কোনো কান শ্রবণ করেনি এমন রূপের বর্ণনা। কোনো হৃদয় কল্পনা করেনি এমন রমণীদের সৌন্দর্য।

আমাকে দেখে তারা হর্ষিত হয়ে উঠল। যেন আনন্দে নেচে উঠলো তাদের মন। তারা আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থন জানাল। এবং তারা আমাকে দেখে সমস্বরে চিৎকার করে উঠল, বিমুগ্ধ আনতনয়না এক হুর রমণীর স্বামী বলে। তাদের এমন সমস্বরিত ধ্বনি শোনে আমি কৌতূহলী হলাম এবং তাদের জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় সে বিমুগ্ধ আনতনয়না হুর রমণী? তারা প্রতিউত্তরে বলল, এখানে নয়। আপনি আরো সামনে চলুন। আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।' অতঃপর তাদের কথায় আমি সামনে চলতে লাগলাম। চলতে চলতে একটি নদীর তীরে এসে দাঁড়াই। নদীর কোমল ও শীতল আবহে পানিতে পা ভিজিয়ে বসে আছে অসংখ্য সুন্দরী হুর। পূর্বের মতোই তাদের রূপ-সৌন্দর্য। তারাও আমাকে 'বিমুগ্ধ আনতনয়না হুর রমণীর স্বামী' বলে সমস্বরে ধ্বনি দিয়ে উঠল। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় সে বিমুগ্ধ আনতনয়না হুর রমণী? পূর্বের হুর রমণীদের মতো তারাও বলল, এখানে নয়। আপনি সামনে চলুন। আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।' আমি আবারো সামনে চলতে শুরু করি। চলতে চলতে একটি দুধের নদীবর্তী তীরে এসে পৌঁছি। পূর্বের মতো এখানেও একদল হুর রমণী ধবধবে সাদা দুধের নদীতে পা ভিজিয়ে খোশগল্প করছে। আমাকে দেখে তারা, বিমুগ্ধ আনতনয়না হুর রমণীর স্বামী বলে সমস্বরে ধ্বনি দিয়ে উঠল। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় সে বিমুগ্ধ আনতনয়না হুর রমণী? তারা বলল 'এখানে নয়। আপনি সামনে চলুন। আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।' আমি আরো দ্বিগুণ কৌতূহলী হলাম। আমার কৌতূহল ক্রমাগত বাড়তে থাকে। চলতে চলতে একটি মধুর শরাবের নদীর তীরে এসে পৌঁছলাম। এখানেও দেখি, একদল হুর রমণী খোশ-গল্পে মত্ত। আমাকে দেখে তারা বিমুগ্ধ আনতনয়না হুর রমণীর স্বামী

বলে সমস্বরে ধ্বনি দিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় সে বিমুগ্ধ আনতনয়না হুর রমণী? তারা চিকন ও মিষ্টি কণ্ঠে জবাব দিলো, এখানে নয়। আপনি সামনে চলুন। আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।' ফের সামনে চলতে থাকি। চলতে চলতে একটি স্বচ্ছ মধুর নদী তীরে এসে পৌঁছি। এখানে একদল হুর রমণী খোশ-গল্পে মেতে আছে। তাদের হাসিতে মুখরিত হয়ে আছে চারপাশ। আমাকে দেখে তারা সমস্বরে বিমুগ্ধ আনতনয়না হুর রমণীর স্বামী বলে ধ্বনি দিলো।

আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় সে বিমুগ্ধ আনতনয়না হুর রমণী? তারা বলল, 'এখানে নয়। আপনি সামনে চলুন। আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।' আমার কৌতূহল দ্বিগুণ হতে থাকে। তাদের কথামতো আবারো চলতে লাগলাম। চলতে চলতে দেখি একটি সুরম্য তাবু। আমি তাবুটির দিকে এগিয়ে গেলাম। তাবুর সামনে একজন হুর প্রহরায় নিযুক্ত। যথারীতি আমাকে বিমুগ্ধ আনতনয়না হুর রমণীর স্বামী বলে স্বাগত জানাল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় সে বিমুগ্ধ আনতনয়না হুর রমণী? হুর প্রহরিণী জবাব দিলো, ভেতরে আছে। চলুন। আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।' তার অনুমতি পেয়ে আমি তাবুর ভেতর প্রবেশ করলাম। দেখি, একজন হুর রমণী সোনার পালঙ্কে বসে আছে। পূর্বের হুরদের চেয়ে তার দেহ সৌন্দর্য অধিক। বরং তার সাথে তাদের কোনো তুলনাই চলে না। আল্লাহর কসম! কোনো চক্ষু এমন সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করেনি। কোনো কান এমন রূপের বর্ণনা কখনো শোনেনি। কোনো হৃদয় এমন সৌন্দর্য কল্পনা করেনি। সে যখন কথা বলে তার চিকন সারিবদ্ধ দুধেল সাদা দন্তরাজি বিকশিত হচ্ছে। সে দন্তরাজির সৌন্দর্যের সামনে চাঁদ-সূর্যের কোনো উপমা অবান্তর। তার মুখের থুথু এমন সুমিষ্ট, যদি এক চিমটি থুথু দুনিয়াতে নিক্ষেপ করে তাহলে পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রের পানি মধু হয়ে যাবে। সে যদি একবার পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে হাসি দেয় তাহলে সূর্যের কিরণ ম্লান হয়ে যাবে। দুনিয়া ছেয়ে যাবে ঘনকৃষ্ণ আঁধারে। আর তার দেহ থেকে ছড়াচ্ছিল এমন সুবাস যার কোনো বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়।

সে হুর রমণীর দেহ সৌন্দর্যে আমি এতই অভিভূত ও বিমোহিত হয়ে পড়ি যে, আমি তার দিকে এগিয়ে যাই এবং তাকে স্পর্শ করতে উদ্যত হই। কিন্তু অমনি সে পিছিয়ে যায় এবং আমাকে বারণ করে তাকে স্পর্শ করা থেকে। বলল, 'আপনি এখনো জীবিত। আপনার ভেতরে প্রাণ আছে। কোনো

প্রাণময় মানুষ আমাদের স্পর্শ করতে পারে না। আপনি বরং আজ আমাদের সাথে ইফতারি করুন।'

আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যিয়াদ বলেন, 'এই ছিল তার স্বপ্নের বিশদ বিবরণ। সে ছিল রোজাদার। প্রতিরাতে সে দীর্ঘ সময় নামাজে দাঁড়িয়ে থাকত আর দিনে রোজা রাখত। যুদ্ধের কঠিন দিনেও সে রোজা ভঙ্গ করত না। তারপর যুদ্ধের সময় ঘনিয়ে এলো। সে ঘোড়ার ওপর চড়ে রণাঙ্গনের দিকে এগিয়ে গেল। সেদিনই রোজা অবস্থায় লড়াই করতে করতে শাহাদতবরণ করে। আল্লাহর রাস্তায় সে শহিদ হলো। তার হৃদয়ের গভীর আকাঙ্ক্ষা পূরণ হলো।'

হে আল্লাহর বান্দাগণ! হে মুসলিম যুব ও তরুণ প্রজন্ম! তার হৃদয়ে ইসলামের অপরিসীম চেতনা কীভাবে প্রোথিত হলো? কে লালন-পালন করেছে তাকে? হ্যাঁ, কুরআন তাকে লালন-পালন করেছে। আল্লাহর পবিত্র কালাম বুকে নিয়ে বেড়ে উঠেছে তার শৈশব। ছোট ও অপ্রাপ্ত বয়স থেকেই আল্লাহর আনুগত্য এবং শরিয়তের বিধি-বিধানের প্রতি সে ছিল সচেষ্ট। অবুঝ বয়স থেকেই তার চিন্তা-চেতনায় ছিল পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের উপলব্ধি।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ * فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * يَلْبَسُونَ مِنْ
سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ * كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ *
يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ * لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ
إِلَّا الْمَوْتَةَ الأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ * فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ
ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ * فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ

'নিশ্চয় মুত্তাকিরা এক নিরাপদ স্থানে থাকবে। উদ্যান ও ঝরনার মাঝে। তারা মিহি ও পুরু রেশম কাপড় পরিধান করবে। একে অপরের সামনা-সামনি বসবে। এমনই হবে। আর তাদের আমি সুনয়না সুন্দরী স্ত্রী দেব। সেখানে তারা প্রশান্ত মনে প্রত্যেক প্রকারের ফল আনতে বলবে। সেখানে তারা মৃত্যু আস্বাদন করবে না। এবং তিনি তাদের

জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন। তোমার প্রভুর অনুগ্রহে। এটাই তো বড় সাফল্য। বস্তুত আমি কুরআনকে তোমার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা মনে রাখতে পারে। অতএব তুমি অপেক্ষা করো, তারাও অপেক্ষা করছে।'[৭৯]

হে আল্লাহর বান্দাগণ! উম্মাহ সর্বদা তাকিয়ে আছে এমন প্রজন্মের দিকে যারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের জান ও মাল উৎসর্গ করতে সদা প্রস্তুত থাকবে। যাদের হৃদয়ে প্রোথিত থাকবে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি সীমাহীন দরদ ও আবেগ। কিন্তু বর্তমান তরুণ প্রজন্মের চিত্র কী? সোনালি প্রজন্মের যুবকদের রাত্রি অতিবাহিত হতো রুকু-সিজদায়। আজকের তরুণ প্রজন্মের রাত্রি অতিবাহিত হয় গান-বাদ্য, অশ্লীলতায়। সোনালি প্রজন্মের যুবকরা কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকত। আজকের তরুন প্রজন্ম ব্যস্ত থাকে গানের সুরে। সোনালি প্রজন্মের যুবকদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার সন্তুষ্টি এবং জান্নাত লাভ। বর্তমান প্রজন্মের তরুণদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হলো পার্থিব জীবনের উন্নতি এবং অঢেল ধন-সম্পদ উপার্জন। খেল-তামাশায় কেটে যাচ্ছে তাদের প্রতিদিনের জীবন। দুনিয়ার মোহ-লালসায় আচ্ছন্ন তাদের অহর্নিশ। যেন পার্থিব সমৃদ্ধিই তাদের একমাত্র আরাধ্য।

---

৭৯ সুরা দুখান: ৫১-৫৯

এ অবস্থা থেকে মুসলিম তরুণ প্রজন্মের উত্তোরণের পথ কী?

এর থেকে উত্তরণের পথ স্বয়ং তরুণরাই। তারা যদি চায় যে আমরা সংশোধন হবো, তাহলে তাদের সংশোধন হবে। তারা যদি চায় আমরা দ্বিগুণ নষ্ট হবো, তাহলে তারা নষ্ট হবে। সংশোধনের চাবিকাঠি তাদের নিজেদের হাতেই। ফিরে আসার মন্ত্র তাদের কণ্ঠেই। তাই হে মুসলিম তরুণ প্রজন্ম! ফিরে এসো। ফিরে এসো রবের দিকে। নিজেদের সংশোধনে ব্রতী হও। নষ্ট জীবনকে পেছনে ফেলে এগিয়ে এসো আলোর দিকে। ইসলামের শাশ্বত চেতনা হৃদয়ে ধারণ করো। হাতে তুলে নাও আলোর মশাল। জ্বালিয়ে দাও দিকে দিকে ইসলামের নুরের বাতি। হৃদয় থেকে হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত করো ওহির আলো।

অনুতপ্ত অশ্রু

তারা ছিল তিন বন্ধু। একসাথে থাকত, চলত এবং ফিরত। তারা তিনজন ছিল ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত। অবাধ্যতায় লিপ্ত। পরস্পরকে তারা আল্লাহর নাফরমানি ও পাপাচারে সহযোগিতা করত। লোকদের সৎকাজ থেকে বিরত রাখত। অসৎকাজে আদেশ করত। সৌভাগ্যক্রমে আল্লাহ তায়ালা তাদের একজনকে হেদায়েত করলেন। অবাধ্যতা থেকে বাধ্যতার পথে ফিরিয়ে আনেন। অসৎপথ থেকে সৎপথে তুলে আনেন। অন্ধকার থেকে আলোর মিছিলে অংশগ্রহণ করে। তার প্রতি এ ছিল আল্লাহ তায়ালার অপার অনুগ্রহ। কিন্তু বাকি দুজন তখনো অন্যায় ও পাপাচারে নিমজ্জিত। সে চাইল তার বাকি দুই বন্ধুকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে চাইল। তারপর শুরু করল ধারাবাহিক প্রচেষ্টা। বিভিন্নভাবে সে তাদের বোঝাতে লাগল। তাদের সামনে তুলে ধরতে লাগল তাদের অবাধ্যতা ও আখেরাতে এর ভয়াবহ পরিণামের কথা। অনবরত চেষ্ট করতে লাগল তাদেরকে সত্য ও আলোর পথে আনতে। পাশাপাশি আল্লাহর নিকট তাদের হেদায়েতের জন্য দোয়া করতে লাগল। গভীর রাতে সে তার বন্ধুদের জন্য আল্লাহর দরবারে চোখের অশ্রু ফেলত। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তার চেষ্টা ও দোয়া কবুল করলেন। তার

চেষ্টার বদৌলতে একদিন তার দুই বন্ধু অবাধ্যতা ও নাফরমানি ছেড়ে দিলো। ফিরে এলো আল্লাহর পথে। ফিরে এলো আলোর পথে। এবার তিন বন্ধু তারা এক পথ ও এক মোহনায় এসে মিলিত হলো। তারা তাদের অতীত জীবনের ভুলের দিকে তাকিয়ে নিদারুণ লজ্জিত হলো। তখন তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, এতদিন পর্যন্ত তারা নাফরমানি ও পাপাচারে লিপ্ত ছিল। লোকদের সৎকাজ থেকে বিরত রাখত। অসৎকাজে আদেশ করত। এখন তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, বাকি জীবন তারা আল্লাহর আনুগত্যে কাটাবে। লোকদের সৎকাজের আদেশ করবে। অসৎকাজ থেকে বিরত রাখবে। তাদের বাকি জীবন পরিচালিত হবে একমাত্র আল্লাহর নির্দেশনা এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর অনুসরণ করে।

তিন বন্ধু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, প্রতিদিন ফজরের আজানের এক ঘণ্টা পূর্বে তারা ঘুম থেকে জাগবে। তখন নিরিবিলি সময়ে একান্তচিত্তে আল্লাহর ইবাদত করবে। তার নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করবে। কেননা, তারা জেনেছে, রাত্রির শেষ প্রহরের এ সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তখন আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের ডাকতে থাকেন আর বলতে থাকেন, কে আছ তওবাকারী? আমি তার তওবা কবুল করব। কে আছ গোনাহ মোচনকারী? আমি তার গোনাহ মোচন করব। কে আছ ক্ষমাপ্রার্থনাকারী? আমি তাকে ক্ষমা করব। তাই তারা সুন্দর ও অধিকতর কল্যাণকর এ সময়কে নিজেদের ইবাদত ও প্রার্থনার জন্য বেছে নিল। প্রতিদিন ঘুম থেকে জেগে তারা নিকটস্থ মসজিদে চলে যেত। ফজর পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকত।

প্রতিদিনের ন্যায় একদিন তারা তিন বন্ধু রাতের শেষ প্রহরে মসজিদের দিকে যাচ্ছে। চারদিক তখন নীরব-নিস্তব্ধ। পুরো পৃথিবী ঘুমের ঘোরে অচেতন। আকাশ-পৃথিবী শান্ত ও গম্ভীর। কোথাও কেউ নেই। চলতে চলতে হঠাৎ একটি বাড়ি থেকে তাদের কানে গান ও মিউজিকের আওয়াজ ভেসে এলো। এটা শুনে তারা তিন বন্ধু থমকে দাঁড়াল। তারপর এগিয়ে গেল বাড়িটির দিকে যেখান থেকে গান ও মিউজিকের আওয়াজ ভেসে আসছে। তারা দেখল, তাদের বয়সি এক তরুণ রাতভর গান ও মিউজিক বাজাচ্ছে। রাতভর সে এভাবেই ব্যস্ত ছিল। এ দেখে সে যুবকের প্রতি দারুণ মায়া জাগল তাদের অন্তরে। তার অবাধ্যতা ও পাপাচার দেখে তাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হলো। তাই তারা চাইল তাকে অবাধ্যতার পথ থেকে আলোর পথে ফিরিয়ে আনতে। প্রথমজন তাকে ডাক দিলো। কিন্তু সে যুবক তার ডাকে

কোনো ভ্রুক্ষেপ করল না। অতঃপর দ্বিতীয়জন ডাকল। এবারও সে কোনো সাড়া দিলো না। সর্বশেষ তৃতীয়জন ডাকল। এবারও পূর্বের মতোই সে নিরুত্তর। বেশ চেষ্টা করেও যখন কোনো কাজ হলো না, তখন নিরুপায় হয়ে তারা মসজিদের দিকে ফিরে আসতে চাইল। তখন তাদের একজন দাঁড়িয়ে গেল। অপর দুজন তার দাঁড়িয়ে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করল? সে বলল, 'আমাদের উচিত তাকে অবাধ্যতা ও নাফরমানির পথ থেকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা। শয়তানের পথ থেকে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত। যদি আজ রাতেই সে মারা যায় তাহলে তার আখেরাত কেমন হবে? হয়তো আজ রাতে আল্লাহ তাকে হেদায়েত দেবেন। আমাদের উচিত আমরা যা পছন্দ করি তা অপর ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করা। সুতরাং ঈমান ও নেক আমলের চেয়ে উত্তম নেয়ামত আর কী আছে? ইসলামের চেয়ে উৎকৃষ্ট পছন্দ আর কী আছে? তাই এসো আমরা তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করি। আজকের রাতটুকু আমরা তার পেছনেই চেষ্টা অব্যাহত রাখি।'

তার কথা শোনে দুই বন্ধু সম্মত হলো। পুনরায় তারা এগিয়ে গেল যুবকের নিকট। বহু চেষ্টার পর তারা যুবকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে সক্ষম হলো। যুবকটি ফিরে তাকালে তারা তাকে ইশারায় বাহিরে বেরিয়ে আসতে আহ্বান জানাল। যুবক তাদের প্রশাসনের সদস্য মনে করে বাহিরে বেরিয়ে এলো। তিনজন প্রথমে হাসিমুখে তাকে সালাম দিলো এবং তার সাথে করমর্দন করল। তার নাম জিজ্ঞেস করল। সে বলল, আমার নাম হাসান। তাদের জিজ্ঞেস করল, কী চাও তোমরা? তারা বলল, 'তুমি কি জানো, এখন কোন সময়? এটি দিনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সময়। অত্যন্ত দামি ও মূল্যবান সময়। এ সময় কেউ আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করলে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। এ সময় তওবাকারীর তওবা কবুল করা হয় । পাপীর পাপ, গোনাহগারের গোনাহ ক্ষমা করা হয়। তুমি আল্লাহর অবাধ্যতা ও নাফরমানিতে ডুবে আছ। সুতরাং তুমি ফিরে এসো। আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করো। তার নিকট অনুনয়-বিনয়ের সাথে সকল গোনাহ থেকে তওবা করো। আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দেবেন। কেননা, আল্লাহ তায়ালা হলেন সবচেয়ে মহান। অতি ক্ষমাশীল। তার হৃদয় দয়া ও রহমে পূর্ণ।

তাদের কথা শোনে হাসান বলল, 'আমি এমন এক গোনাহগার আল্লাহ যাকে কখনো মাফ করবেন না। আমি আজন্ম আল্লাহর অবাধ্যতা ও পাপাচারে লিপ্ত

রয়েছি। কখনো কোনো ভালো কাজ করিনি। আমার হৃদয় আল্লাহর নাফরমানিতে কালো হয়ে গেছে। তিনি আমাকে কখনো ক্ষমা করবেন না।' এবার তারা তিনজন হাসানকে বোঝাতে শুরু করল। তখন রাতের শেষ প্রহর। পৃথিবী নীরব-নিস্তব্ধ হয়ে আছে। রাত্রির অখণ্ড নীরবতায় গুরুগম্ভীর কণ্ঠে তারা হাসানের সামনে তুলে ধরল আল্লাহর পরিচয়। একে একে তারা আল্লাহর গুণাবলি হাসানের সামনে ফুটিয়ে তুলতে লাগল। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু, তিনি বান্দার তওবা কবুল করেন, ইত্যাদি প্রলুব্ধ কথাবার্তায় তারা হাসানের হৃদয় গলানোর চেষ্টা চালাতে লাগল। তারা তাকে শোনাল পবিত্র কুরআনের বাণী।

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى

'আর যে তওবা করে, ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং সঠিক পথের অনুসরণ করে, তার প্রতি আমি ক্ষমাশীল।'[৮০]

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

'তারা ব্যতীত যারা তওবা করে, ঈমান রাখে এবং সৎকাজ করে; আল্লাহ তাদের পাপসমূহ পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৮১]

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى

'যে তওবা করে, ঈমান রাখে, সৎকাজ করে আর সঠিক পথ অনুসরণ করে, তার প্রতি আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল।'[৮২]

---

৮০ সুরা তহা: ৮২

৮১ সুরা ফুরকান: ৭০

৮২ সুরা তহা: ৮২

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

'তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।'[৮৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

التائب من الذنب كمن لا ذنب له

'গোনাহ থেকে তওবাকারী ঐ ব্যক্তির মতো, যার কোনো গোনাহ নেই।'

হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন, 'বান্দা যদি পাহাড় সমপরিমাণ গোনাহ নিয়েও আমার দিকে ফিরে আসে আমি তাকে ক্ষমা করে দিই। এবং আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করতে কোনো প্রকার পরোয়া করি না।'

এভাবে একের-পর-এক আল্লাহর পরিচয় তারা তুলে ধরতে থাকে হাসানের সামনে। তাকে অভয় দিতে লাগল। তার হৃদয়ে সাহস সঞ্চার করছে। সেইসঙ্গে তাদের নিজেদের অতীত জীবন এবং আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক তাদের সৎপথে ফিরে আনার গল্পও তারা শোনাল হাসানকে। সব শুনে হাসান চুপ মেরে দাঁড়িয়ে আছে। কোনো কথা বলছে না। ভাবনার অথৈ সমুদ্রে হারিয়ে গেছে হাসান। চিন্তার মনোজগতে ডুব দিয়ে কী যেন ভাবছে। আগন্তুক তিনজন তাকিয়ে আছে হাসানের দিকে। তারাও চুপ। কোনো কথা বলছে না। হাসানকে তারা ভাবনার অফুরন্ত সময় দিচ্ছে। আর নিঃশব্দে দোয়া করছে আল্লাহ তায়ালা নিকট। তিনি যেন হাসানকে ফিরিয়ে দেন সুপথে। গোনাহ ও পাপাচারের গলিজ ও দুর্গন্ধ জীবন পেছনে ফেলে হাসান যেন ফিরে আসে শাশ্বত সত্যের পথে। হাসান যেন হয় তাদেরই একজন। যে লোকদের সৎকাজের আদেশ করবে। অসৎকাজ থেকে বিরত রাখবে। আল্লাহর আনুগত্য এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহভিত্তিক জীবন পরিচালনা করবে। তারা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হাসানের দিকে। এদিকে সময়ও ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। হঠাৎ তারা প্রত্যক্ষ করে, হাসানের

---

৮৩ সুরা যুমার: ৫৩।

চোখে-মুখে ফুটে উঠতে লাগল সত্য ও সুন্দরের আভা। যেন ভাবনার অথৈ দিগন্ত পেরিয়ে আলোর এক বন্দরে নোঙর করেছে সে। হাসানের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো আকাঙ্ক্ষিত সে কথা। 'আমি তওবা করতে চাই।' তারা তিনজন আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করল। অপার তৃপ্তিতে তাদের হৃদয়ে আনন্দের বান বয়ে যেতে লাগল। চোখে-মুখে ফুটে উঠল দৃপ্তির রেখা। অতঃপর হাসান তাদের থেকে অনুমতি নিয়ে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করল। উত্তমরূপে গোসল করল। শরীরে উত্তম সুগন্ধি মাখল। এক পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হৃদয় নিয়ে হাসান তাদের সাথে মসজিদের দিকে হাঁটতে লাগল। আজ তারা চারজন। একদিন ছিল একজন। তারপর দুইজন। তারপর তিনজন। আজ তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হাসান।

এভাবেই আলোর কাফেলা ক্রমশ বাড়তে থাকে। সত্যের দিকে মানুষের ছুটে চলা এভাবে বাড়তে থাকে। যদি ব্যথিত হৃদয় এবং সংবেদনশীল মন নিয়ে পাপী ও গোনাহগারদের আল্লাহর পথের দিকে ডাকা হয় তাহলে সত্যিই তারা সে ডাকে সাড়া দেবে। তাদের হৃদয়ে বেজে উঠবে শাশ্বত সত্য সুন্দরের ধ্বনি।

হাসান তাদের সাথে মসজিদে প্রবেশ করল। জীবনে কোনোদিন হাসান মসজিদে আসেনি। কোনোদিন সে সিজদা করেনি আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালাকে। কোনোদিন সে প্রভুর দরবারে নত করেনি মাথা। গোনাহ ও নাফরমানির দরিয়ায় ডুবে ছিল আকণ্ঠ। ইমাম সাহেব ফজরের সালাত শুরু করলেন। আজ হাসানও দাঁড়াল সকলের সাথে। ইমাম সাহেব আবেগমথিত কণ্ঠে হৃদয় উজাড় করে পড়তে থাকেন মহান রবের পাক কালাম। মসজিদজুড়ে ছড়িয়ে পড়ল মধুর কণ্ঠের এক পবিত্র সুরলহরী। ইমাম সাহেব সেদিন তিলাওয়াত করেন,

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ
رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا

'আমার এ কথা লোকদের বলে দিন, হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করছ। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সকল গোনাহ

ক্ষমা করে দেন। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।' [৮৪]

হ্যাঁ, সত্যিই আমার রব তার বান্দাদের প্রতি সীমাহীন দয়ালু। তিনি তাদের তওবা কবুল করেন। মুছে দেন তাদের সমুদ্র পরিমাণ পাপ। তিনি অপেক্ষায় থাকেন, কখন বান্দা ফিরে আসবে। কখন তওবা করবে। কখন বান্দা হৃদয় উজার করে তার পবিত্র নাম উচ্চারণ করবে। বরং আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা এতই দয়ালু, এতই ক্ষমাশীল যে, রাত্রির শেষ মুহূর্তে তিনি বান্দাদের লক্ষ্য করে ডাকতে থাকনে, আছে কি কোনো তওবাকারী? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। আছে কি কোনো পাপ মোচনকারী? আমি তার পাপ মোচন করে দেব। আছে কি কোনো ক্ষমাপ্রার্থনাকারী? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব।

হে যুবক! হে তরুণ! দেখো, যে হাসান বলেছিল—আমি এমন পাপী আল্লাহ যাকে কখনো ক্ষমা করবেন না। জাহান্নাম কেবল আমার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। আমার জন্যই প্রজ্বলিত করা হয়েছে জাহান্নামের লেলিহান আগুন। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা হাসানের মতো জঘন্য পাপী ও গোনাহগার বান্দাকেও অভিশপ্ত পথ থেকে তুলে এনে মসজিদে প্রবেশ করিয়েছেন। দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন নামাজে। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার সম্মুখে। কতই-না মেহেরবান আমার রব। কতই-না দয়ালু আমার প্রভু।

অতঃপর হাসান ফজরের সালাত শেষে তাদের সাথে মসজিদ থেকে বেরিয়ে এলো। হাসান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। তাদের অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল। এবার হাসান একে একে তার অতীত জীবনের কাহিনি তাদের নিকট বর্ণনা করতে লাগল। তার পাপ ও গোনাহের ধারাবাহিক বিবরণ সে তাদের শোনাতে লাগল। আর তার চোখ দিয়ে প্রবহমান ঝরনার মতো অনুতপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। তারা হাসানকে সান্ত্বনার বাণী শোনাতে লাগল। একপর্যায়ে হাসান হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। কেউ তাকে তার কান্না থেকে বিরত রাখতে পারছিল না। কান্নামাখা কণ্ঠে হাসান তাদের বলল, গ্রামে আমার বৃদ্ধ পিতা এবং বৃদ্ধ মা রয়েছে। তারা জীবনের বার্ধক্যে পদার্পণ করেছে। তারা এখন কাজ-কর্ম এবং চলাফেরায় অন্যের মুখাপেক্ষী। কিন্তু আমি তাদের কোনো সেবা করছি না।

---

৮৪ সুরা যুমার: ৫৩

বরং তাদের ওপর অনেক অত্যাচার করেছি। আমি তাদের সীমাহীন কষ্ট দিয়েছি। তারা দূর গ্রামে থাকে। আমি দীর্ঘ সময় তাদের দেখতে যাই না। জানি না গ্রামে কেমন আছে তারা। আমি তাদের এত কষ্ট দিয়েছি, হয়তো কোনোদিন তারা আমাকে ক্ষমা করবে না। হাসানের এমন কান্না তাদের অন্তরকে ব্যথিত করল। তাদের হৃদয়কে স্পর্শ করল।

তারা হাসানকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামে তার পিতা-মাতার নিকট গেল। হাসানের পিতা ফজরের সালাত শেষ করে ঘরে ফিরেছেন মাত্র। হাসানকে বাড়ির বাহিরে রেখে তারা তিনজন বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করল। মমতা জড়ানো কণ্ঠে তারা হাসানের পিতাকে সালাম জানাল। গ্রাম্য বৃদ্ধ প্রথমে তাদের চিনতে পারেনি। তারা নিজেদের হাসানের বন্ধু বলে পরিচয় দিলো। হাসানের নাম শোনামাত্র বৃদ্ধ লোকটি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। উত্তেজিত তবে কিছুটা বেদনামাখা কণ্ঠে বললেন,'হাসান! যে সর্বদা আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকে। পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়। আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করুক। সে আমাদের যেভাবে কষ্ট দিয়েছে আল্লাহ তাকে তদ্রূপ কষ্ট দিক।' বৃদ্ধের কথা শুনে একজন বলল, হাসান তওবা করেছে এবং অতীত জীবন থেকে ফিরে এসেছে। এ কথা শোনে বৃদ্ধ চমকে উঠল। তার চোখে-মুখে ফুটে উঠল বিস্ময়ের রেখা। অবিশ্বাসের সুরে তিনি বললেন, হাসান তওবা করেছে? কোন হাসান? আমার ছেলে? এবার দৃঢ়তার সঙ্গে তারা বলল, হ্যাঁ, আপনার সন্তান হাসান। আজ আমাদের সঙ্গে সে মসজিদে জামাতের সাথে ফজরের নামাজ আদায় করেছে। আমরা তাকে আপনার নিকট নিয়ে এসেছি। সে আপনাদের নিকট ক্ষমা চাইতে এসেছে। আপনি কি হাসানকে ক্ষমা করবেন না?' এ কথা শোনে বৃদ্ধ হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন। তার চোখ ফেটে অশ্রু ঝরতে লাগল। অতঃপর আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে শুকরিয়া আদায় করলেন। হাসানকে তারা তার পিতার সামনে এনে হাজির করল। বৃদ্ধ পিতা অনেকদিন পর সন্তানকে দেখে আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। আদর ও স্নেহের সাথে জড়িয়ে ধরলেন হাসানকে।

হে মুসলিম যুব প্রজন্ম! ফিরে এসো তোমাদের মহান রবের দিকে। অন্যায় ও পাপের জীবন ছেড়ে আলোর জীবন গ্রহণ করো। অতীত নাফরমানি থেকে বিশুদ্ধ হৃদয়ে আল্লাহ তায়ালার নিকট তওবা করো। তিনি বান্দাকে ক্ষমা

করে দেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। কোনো বান্দা যখন তওবা করে তখন তিনি তার প্রতি সীমাহীন খুশি হোন।

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا

'আমার এ কথা লোকদের বলে দিন, হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করছ। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেন। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।'[৮৫]

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى

'আর যে তওবা করে, ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং সঠিক পথের অনুসরণ করে, তার প্রতি আমি ক্ষমাশীল।'[৮৬]

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

'তারা ব্যতীত যারা তওবা করে, ঈমান রাখে এবং সৎকাজ করে; আল্লাহ তাদের পাপসমূহ পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৮৭]

---

৮৫ সুরা যুমার: ৫৩

৮৬ সুরা তহা: ৮২

৮৭ সুরা ফুরকান: ৭০

হে তরুণ! উম্মাহ ডাকছে তোমায়

আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মুসলিম যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। ইসলামের ইতিহাসের এক অজেয় ও কিংবদন্তি মহানায়কের গল্প বলব। যিনি ছিলেন সাহসিকতা ও বীরত্বে অনন্য। ছিলেন ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ। ইসলামের জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছেন যিনি এটি তার গল্প। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে সে গল্পের পুনরাবৃত্তি আজ অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছে। মুসলিম উম্মাহর আজ এমন সাহসী তরুণের প্রয়োজন, যারা ইসলামের গতিধারা পাল্টে দেবে। যারা প্রতিহত করবে ইসলামের ওপর আপতিত আক্রমণ। যারা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর শত্রুদের মোকাবেলা করবে শক্তহাতে। শুধু কথা নয় কাজেও যারা হবে উম্মাহর অতন্দ্র প্রহরী। আজ কথার ফুলঝুরি ফোটানোর মতো বহু ব্যক্তি আছে কিন্তু কর্মের ময়দানে তারা শূন্য। উম্মাহর প্রয়োজনের সময় তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না।

আল্লাহ তায়ালার ঘোষণার বাস্তবায়ন প্রয়োজন। তিনি বলেছেন,

رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ

> 'কতক লোক যারা আল্লাহকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছে।'[৮৮]

মুসলিম উম্মাহর আজ এমন কতিপয় ব্যক্তির প্রয়োজন যারা ইসলামকে তার পুরনো গতিপথে ফিরিয়ে দেবে। ফিরিয়ে আনবে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর হারানো গৌরব। যারা ইসলামকে তার প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছাতে নিজেদের জান-মাল কুরবান করবে। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় উৎসর্গ করবে দেহের প্রতি ফোটা রক্ত। আজ প্রয়োজন তাদের যারা উষ্ণ রক্ত প্রবাহিত করতে মোটেও ভয় করবে না। জালিমের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে যারা কালিমার ঝান্ডা হাতে এগিয়ে যাবে সম্মুখপানে। যাদের হৃদয়ে থাকবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের প্রতি স্পৃহা। পার্থিব কোনো লালসা যাদের হঠাতে পারবে না। তাদের প্রতিটি নিঃশ্বাস, প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি

---

৮৮ সুরা আহযাব: ২৩

কাজ হবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য। আর তাদেরই হাতে রচিত হবে ইসলামের নয়া ইতিহাস। আল্লাহর কসম! আজ তো উম্মাহর এমন কতিপয় ব্যক্তির প্রয়োজন। উম্মাহর ভাগ্যাকাশে যেদিন উদিত হবে তাদের মতো কতিপয় নক্ষত্র সেদিন প্রকৃতপক্ষে মুসলিম জাতি ঘুরে দাঁড়াবে। লাঞ্ছনা ও অপমানের শিকল ভেঙে তারা বেরিয়ে আসবে সম্মান ও বিজয়ের রণাঙ্গনে।

এ উম্মতকে আল্লাহ তায়ালা সকল উম্মতের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। পূর্ববর্তী সকল জাতির চেয়ে সম্মান ও মর্যাদায় অগ্রগামী করেছেন। কারণ এ উম্মতের নবী হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। এ উম্মতকে আল্লাহ তায়ালা এক কল্যাণকর জাতি হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। মানুষের কল্যাণে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাদের নির্বাচিত করেছেন। তারা হলো মধ্যপন্থি উম্মাহ। পূর্বে অতিবাহিত সকল উম্মতের মধ্য থেকে এ উম্মতকে নির্বাচন করেছেন। এ উম্মতের রয়েছে প্রভূত ফজিলত, যা পূর্বেকার উম্মতদের আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা দেননি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

من أمتي سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب،

وجوههم كالقمر ليلة البدر

> ‘আমার সত্তর হাজার উম্মত বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল।’[৮৯]

নিশ্চয় এটি উম্মতে মুহাম্মদির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উম্মতের মুহাম্মদির প্রতি মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ ও অশেষ কৃপা। অন্যান্য উম্মতের ওপর উম্মতে মুহাম্মদিকে বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন নিছক এমনিতেই নয়। বরং এর পেছনে রয়েছে বহু কারণ। সেসব কারণের একটি হলো সাহসিকতা। আল্লাহ তায়ালা উম্মতে মুহাম্মদিকে অন্যান্য উম্মতের চেয়ে অধিকতর সাহসিকতা দান করেছেন। তাদের বক্ষে দিয়েছেন আল্লাহর দ্বীনের জন্য অপরিসীম স্পৃহা ও বীরত্ব। এলায়ে কালিমাতুল্লাহ তথা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তারা জীবনবাজি রাখতে কুণ্ঠাবোধ করে না। যা নিঃস্বার্থ এবং কেবলই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের

---

৮৯ *তাবারানি*

লক্ষ্যে। তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন উদ্দেশ্য নয়। আর এ বৈশিষ্ট্য উম্মতে মুহাম্মদিকে অন্যান্য উম্মতের ওপর মর্যাদা ও সম্মানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছে।

খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.

হে আল্লাহর বান্দাগণ! হে উম্মাহর অতন্দ্র প্রহরী তরুণ শক্তি! এমন এক ব্যক্তির জীবন ও কর্মপন্থা আজ আলোচনা করব যা আমাদের ঈমানকে শানিত করবে। যার জীবনপ্রবাহ সাহসী করে তুলবে আমাদের হৃদয়কে। তার আত্মোৎসর্গের বিরল ঘটনা আমাদের ইসলামের জন্য আরো নিবেদিতপ্রাণ করে তুলবে। তিনি এমন এক ব্যক্তি উম্মাহর কোনো সদস্য তার সম্পর্কে অনবগত নয়। ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সকলের নিকট তিনি অত্যন্ত সুবিদিত। তার নাম ও প্রশংসনীয় সাহসিকতা প্রসিদ্ধ। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে তিনি স্বীকৃত ও বরিত। ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে তার নাম।

যখন তার বীরত্বের আলোচনা করা হয়, মনে হয় তিনিই ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ বীর। যখন ইসলামের জন্য তার আত্মোৎসর্গের আলোচনা করা হয়, মনে হয় তিনিই ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রহরী। যখন তার বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা হয়, মনে হয় তিনি এ উম্মতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। ইসলামের ইতিহাস এবং মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি সদস্যের নিকট তার নাম আকাশে উদিত সূর্যের মতো দেদীপ্যমান। রাতের আকাশে ধ্রুব-নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল।

তিনি কে?
কে তিনি, যার এত মহিমা?
যিনি পাল্টে দিয়েছেন ইতিহাসের গতিধারা?
যিনি রচনা করেছেন বিপ্লবের সোনালি দাস্তান?
তিনি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.। ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ কাফেলার অন্যতম সঙ্গী। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সাহাবি। যার রক্ত ও শ্রমের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ইসলামের ভিত্তি। যার সাহসিকতা ও বীরত্বে সিঞ্চিত হয়েছে ইসলাম নামক বৃক্ষ।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ, ইসলাম যাকে দিয়েছে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট। ইসলাম তাকে বানিয়েছে মানবেতিহাসের বরিত ব্যক্তি। তাকে পৌঁছে দিয়েছে সম্মান ও মর্যাদার সর্বোচ্চ চূড়ায়। ছিলেন একজন মুশরিক ও অগ্নিপূজক। প্রথম জীবনে মক্কার কাফেরদের হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়েছেন। কালিমার বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই করেছেন। উহুদের যুদ্ধে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবিদের বিরুদ্ধে সাহসী ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ। সেদিন তার বিরল প্রজ্ঞাপূর্ণ নেতৃত্ব ও অসীম বীরত্বে কাফেররা মুসলমানদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

খালিদ বিন ওয়ালিদ তখন কাফের। ইসলাম ও মুসলমানদের ঘোরতর শত্রু। তখন তার কোনো মর্যাদা ছিল না। কোনো খ্যাতি ছিল না। কিন্তু ইসলাম তাকে বদলে দিয়েছে। ইসলাম তাকে ইতিহাসের অমর ব্যক্তি হিসেবে ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ক্রমে ক্রমে মক্কার কাফের ও অগ্নিপূজকরা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে লাগল। একদিন খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর অন্তরেও উদয় হলো ইসলামের সূর্য। তিনি এলেন আল্লাহর রাসুলের দরবারে। ইসলাম গ্রহণ করলেন। তারপর? তারপর বদলে গেল খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর জীবনধারা। তিনি হয়ে গেলেন ইসলামের সাহসী সিপাহি। বীর সেনানী। ইসলামের ঝান্ডা হাতে দাপিয়ে বেড়াতে লাগলেন রণাঙ্গন থেকে রণাঙ্গনে। এক যুদ্ধ থেকে আরেক যুদ্ধে। মুতার ধূসর প্রান্তর থেকে ইয়ামামার রক্তাক্ত প্রাচীর পর্যন্ত ছিল তার নিপুণ বীরত্ব। তার সাহসিকতা ও অসীম বীরত্বে ইসলামের বিজয় হতে লাগল একের-পর-এক। আর তিনি হয়ে উঠলেন ইসলামের অন্যতম স্তম্ভশক্তি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উপাধি দিলেন সাইফুল্লাহ তথা আল্লাহর তরবারি বলে। ইতিহাস তার বীরত্বগাথা সংরক্ষণ করেছে সোনালি হরফে।

আজ মুসলিম উম্মাহর ভাগ্য পরিবর্তনে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের মতো ব্যক্তি দরকার। ইসলামের নতুন ইতিহাস রচনার জন্য খালিদ বিন ওয়ালিদের মতো সাহসী ও আত্মনিবেদিত ব্যক্তিদের বড় প্রয়োজন। যাদের হাতে রচিত হবে ইতিহাসের নতুন দাস্তান। যে ইসলাম একজন মুশরিককে ইতিহাসের মহানায়ক বানিয়েছে আজও সে ইসলাম বিদ্যমান। যে ইসলাম একজন অগ্নিপূজককে বানিয়েছে মহাপুরুষ। সে ইসলাম আজও রয়েছে।

আল্লাহর শপথ! আজও জন্ম হতে পারে কোনো মায়ের উদর থেকে নতুন কোনো খালিদ।

আজ মুসলিম তরুণ ও যুব প্রজন্মকে ইতিহাসের মহামানবদের জীবনী পাঠ করতে হবে। তাদের জীবনী ও ইতিহাস অত্যন্ত মনোযোগের সাথে পড়তে হবে। চিন্তা করতে হবে তাদের বিজয়ের রহস্য সম্পর্কে। তাদের কর্মপন্থা সম্পর্কে ভাবতে হবে। সে-সমস্ত বীরদের বীরত্বের ইতিহাস পড়তে পড়তে হৃদয়ে বীরত্বের স্পৃহা জাগবে। ইসলামের বীর সেনানীদের জীবনী পাঠে অন্তরে ইসলামের জন্য অসীম আত্মত্যাগের মানসিকতা তৈরি করতে হবে। যে ইসলামের পরশে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের মতো ব্যক্তির জন্ম হয়েছে, চৌদ্দশ বছর পর সে ইসলামের পরশে আজও অনেক নতুন খালিদ তৈরি হতে পারে। প্রয়োজন শুধু ইসলামের জন্য নিষ্ঠা ও নিবেদিতপ্রাণ। উম্মাহর আজ আরো বহু খালিদ বিন ওয়ালিদের প্রয়োজন। ইসলামের আকাশে বহু ফেতনা মাথা চাড়া দিয়েছে। কালো মেঘের মতো তাদের গর্জন ইসলামের আলোকে নির্বাপিত করতে চাচ্ছে। এহেন সময়ে ইসলামের ঝান্ডা শক্তহাতে ধরে বিজয়ের বন্দরে নোঙর করাতে প্রয়োজন অনেক অনেক খালিদ বিন ওয়ালিদ। উম্মাহ আজ চাতক পাখির ন্যায় তাকিয়ে আছে নতুন খালিদের দিকে। উম্মাহর এ স্বপ্ন আশা পূরণ করতে পারে কেবল তরুণ প্রজন্ম। আজ মুসলিম যুবকদের হৃদয় ও মানসিকতা যদি ইসলামের জন্য নিবেদিত হয়, তারা যদি নিজেদের জীবন আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় উৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত না হয়, তাহলে জেনে রাখো একবিংশ শতাব্দীতে এ উম্মাহর প্রতিটি তরুণই হবে একেকজন খালিদ বিন ওয়ালিদ।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. তখনও কাফের। তার চিন্তা-বুদ্ধি, যুদ্ধের নিপুণ কৌশল কাফেরদের শক্তিকে বৃদ্ধি করছিল। তার উপস্থিতি ছিল কাফেরদের জন্য দ্বিগুণ সাহস সঞ্চারকারী। মক্কার যে কজন দুর্ধর্ষ ব্যক্তির শক্তি ও সাহস ছিল সমগ্র আরবে প্রসিদ্ধ, যাদের নাম শুনলে শিশুরা ভয়ে ঘুমিয়ে পড়ত, খালিদ বিন ওয়ালিদ ছিলেন তাদের অন্যতম।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার অপার মহিমা যে, একদিন তার হৃদয়ে উদয় হলো ইসলামের স্নিগ্ধ আলো। ইসলামের প্রতি কোমলতা অনুভব করলেন তিনি। কুফর ও শিরকের আগুন তার অন্তরকে জ্বালিয়ে ভষ্ম করে দিয়েছিল। তার জন্য তাই প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াল ঈমানের শীতল বারিষ। তখন তিনি মনে মনে ভাবলেন, একজন সঙ্গী যদি পাই যে আমার সাথে মদিনায় যাবে তাহলে তাকে নিয়ে মদিনায় মুহাম্মদের নিকট যেতাম। কারণ, একাকী দীর্ঘ এ পথ পাড়ি দেওয়া কঠিনই বটে। সৌভাগ্যক্রমে তখন মক্কার আরেক সাহসী হযরত উসমান ইবনে মাযউন রা.-এর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ তার ইচ্ছার কথা তার নিকট ব্যক্ত করলেন। শুনে তিনিও সম্মত হলেন মদিনায় যাবেন। তারা দুজন যখন হাঁটতে হাঁটতে মক্কার উপকণ্ঠে এলেন তখন হযরত আমর ইবনুল আস রা.-এর সাথে দেখা। তাদের মদিনায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যেতে দেখে তাৎক্ষণিক তিনিও প্রস্তুত হয়ে গেলেন তাদের সঙ্গে মদিনায় যাওয়ার জন্য। তিনজন এবার পথ চলছেন মদিনার দিকে। তিনজনই তখন কাফের।

ইসলাম গ্রহণের মহৎ উদ্দেশ্যে তারা যাচ্ছেন মদিনায়। রাসুলের দরবারে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হয়ে তারা তিনজন সালাম দিলেন। নবীজি তাদের কাছে ডাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন তাদের আগমনের কথা। তখন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনি যদি আমাকে ক্ষমা করে দেন তাহলে আমি ইসলাম গ্রহণ করব। প্রতিটি ক্ষেত্রে আমি ইসলামকে বাধা দিয়েছি। প্রতিটি যুদ্ধে আমি ইসলাম ও মুসলমানদের অপূরণীয় ক্ষতি করেছি।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দিলেন। আর ইসলাম তো পূর্বের সকল গোনাহকে ক্ষমা করে দেয়। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. সেদিন

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক হাতে ইসলাম গ্রহণ করলেন। কুফরের ঘৃণিত অধ্যায় চুকিয়ে তিনি প্রবেশ করলেন ইসলামের আলোয়। অন্ধকার জীবন পেছনে ফেলে প্রবেশ করলেন ইসলামের শাশ্বত আলোকময় জীবনে।

রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. এখন মুসলমান। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন প্রিয় সাহাবি। ইসলামের নিবেদিত সৈনিক। মুসলিম বাহিনীর একজন সাহসী সদস্য। ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানের সাথে বহু যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। প্রতিটি যুদ্ধে তিনি প্রদর্শন করেছেন সীমাহীন বীরত্ব। তার অসীম সাহসে কেঁপে উঠত রণাঙ্গন। শত্রুপক্ষ তার ভয়ে থাকত কম্পমান। প্রচণ্ড সাহসিকতায় তিনি শত্রুদের ভেতর ঢুকে পড়তেন। তার বীরত্বগাথা ইতিহাসে আলো করা। তেমনি একটি যুদ্ধ রোমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধ।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর সকল রাজা-বাদশাহদের নিকট ইসলামের দাওয়াতপত্র প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রোম সম্রাটের নিকট দূতের মাধ্যমে একটি চিঠি প্রেরণ করলেন। চিঠি নিয়ে গেলেন হযরত হারেসা ইবনে উমায়ের রা.। কিন্তু পথিমধ্যে ঘটে গেল এক নৃশংস ঘটনা। পাপিষ্ঠ সুরাহ বিন আমর নবীজির পাঠানো দূত হযরত হারেসা ইবনে উমায়ের রা.-কে মুতার প্রান্তরে নৃশংসভাবে হত্যা করে। সুরাহ বিন আমর ছিল রোম সম্রাটের নিযুক্ত গভর্নর। তৎকালীন সময়ে দূত হত্যা ছিল অত্যন্ত জঘন্য। দূত হত্যার সংবাদ শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীষণ ক্ষিপ্ত হলেন। তখনই অঙ্গীকার করলেন দূত হত্যার প্রতিশোধ নেবেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদ বিন হারেসা রা.-কে সেনাপতি করে তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন রোমানদের বিরুদ্ধে। মাত্র তিন হাজার সৈন্য নিয়ে হযরত যায়েদ বিন হারেসা রা. রওনা হলেন রোমের অভিমুখে। মুসলমানদের আগমনের সংবাদ পৌঁছে গেল রোম সম্রাটের নিকট। খবর পেয়ে রোম সম্রাট মুসলমানদের

বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী বাহিনী প্রস্তুত করে। এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্যের বিশাল সৈন্যবাহিনী তৈরি হলো।

মুসলমানদের তিন হাজার সৈন্যের মোকাবেলায় শক্তিশালী রোমানদের এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য। বাহ্যত মুসলমানদের কাফেলাকে কিছুই মনে হয় না। এত বড় বাহিনীর সাথে সামান্য সৈন্য দিয়ে কুলিয়ে কীভাবে সম্ভব। কিন্তু মুসলমান কখনো সংখ্যা ও বাহ্যিক উপকরণের ভিত্তিতে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে না। মুসলমানদের সাহায্য তো আসে আসমান থেকে। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা উপর থেকে তাদের জন্য সাহায্য প্রেরণ করেন। বাহ্যিক আসবাব উপকরণের সাথে মুসলমানদের বিজয়ের কোনো সম্পর্ক নেই।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন,

إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

'আল্লাহ যদি তোমাদের সাহায্য করেন তাহলে তোমাদের ওপর কেউ বিজয়ী হতে পারবে না। আর তিনি যদি তোমাদের পরিত্যাগ করেন তাহলে তিনি ছাড়া এমন কে আছে যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? তাই মুমিনগণ যেন আল্লাহর ওপর ভরসা করে।'[৯০]

আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ۚ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

'যুদ্ধক্ষেত্রে মিলিত হওয়া দুটো দলের মধ্যে তোমাদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন ছিল। একটি দল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছিল আর অন্যটি ছিল কাফেরদের দল; যারা

---

৯০ সুরা আলে ইমরান: ১৬০

ঈমানদারদের চোখের দেখায় দ্বিগুণ দেখেছিল। আর আল্লাহ যাকে চান স্বীয় সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয় ঐ ঘটনার মধ্যে দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য রয়েছে শিক্ষা।'[৯১]

অন্য আয়াদে আল্লাহ তাআলা বলেন,

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

'আল্লাহর হুকুমে কত ছোট দল কত বড় দলকে পরাজিত করেছে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।'[৯২]

অভিযানে প্রেরণ করার পূর্বে মুসলিম বাহিনীকে লক্ষ্য করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যুদ্ধে সেনাপতি যায়েদ যদি শহিদ হয়, তাহলে পরবর্তী সেনাপতি নিযুক্ত হবে জাফর ইবনে আবু তালেব। জাফর যদি শহিদ হয়, তাহলে পরবর্তী সেনাপতি হবে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা। যদি আবদুল্লাহও শহিদ হয়ে যায় তাহলে মুসলমানদের ভেতর থেকে পছন্দনীয় ব্যক্তিকে সেনাপতি নির্বাচন করা হবে।'

আর কোনো যুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনজন সেনাপতি নিযুক্ত করেননি। আর যে তিনজনকে ধারাবাহিক সেনাপতি নিযুক্ত করেছেন তারা ছিলেন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাদের বৈশিষ্ট্য ছিল, তারা দিনের আলোতে ঘোড়সওয়ার ও দক্ষ সমরনায়ক এবং রাতের আঁধারে সাধক, তাহাজ্জুদ ও জিকির-আজকারে মত্ত থাকতেন।

স্বভাবতই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ যুদ্ধের গুরুত্ব ছিল অত্যধিক। হযরত যায়েদ ইবনে হারেসার নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী ছুটে চলল। মুসলমানদের ততদিনে শক্তি ও সামর্থ্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন আর পূর্বের মতো অত দুর্বল ও সহায় সম্বলহীন নয়। অস্ত্রের ঝনঝনানি আর ঘোড়ার ক্ষুরধ্বনিতে তারা বহুবার প্রকম্পিত করেছে আরবের মাটি। জর্দানের মাআন নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন মুসলিম সেনাপতি হযরত যায়েদ

---

৯১ সুরা আলে ইমরান: ১৩
৯২ সুরা বাকারা: ২৪৯

ইবনে হারেসা। রোমান বাহিনী মুসলমানদের অদূরেই যুদ্ধের তাবু স্থাপন করে।

কাফেরদের সৈন্যসংখ্যা দেখে মুসলিম বাহিনী ভাবনায় পড়ে গেল। তাদের কপালে দেখা দিলো নিদারুণ চিন্তার ভাঁজ। কিছুটা ভয়ও। এত বড় বাহিনীর মোকাবেলা করতে হবে ভাবতে পারেননি সেনাপতি যায়েদ ইবনে হারেসা। সৈন্যও তাদের অতি সামান্য। এমতাবস্থায় করণীয় কী হতে পারে এ নিয়ে ভাবতে থাকেন সাহাবায়ে কেরাম। পরস্পরে চলতে থাকে বিভিন্ন শলা-পরামর্শ। কেউ বললেন, রোমানদের সৈন্যসংখ্যা জানিয়ে পত্র লেখা হোক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট। রাসুল আমাদের যে পরামর্শ দেবেন আমরা সে অনুযায়ী কাজ করব। কেউ বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমরা সংখ্যাধিক্য এবং শক্তির ওপর ভরসা করে যুদ্ধ করি না। আমরা যুদ্ধ করি দ্বীনের জন্য। সুতরাং আমরা যে উদ্দেশ্যে বের হয়েছি, সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করব। আল্লাহ আমাদের দুটি কল্যাণের কোনো একটি অবশ্যই দান করবেন। হয় বিজয়, নয় আল্লাহর পথে শাহাদত।

সর্বশেষ সেনাপতি হযরত যায়েদ বিন হারেসা রোমানদের সাথে যুদ্ধ পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। মুসলিম বাহিনীকে উদ্দেশ্য করে তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তাদের সংখ্যাধিক্য যেন আমাদের হৃদয়ে কোনো ভীতি সঞ্চার করতে না পারে। আমরা সংখ্যার ভিত্তিতে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করি না। আমাদের সাহায্য প্রেরিত আল্লাহর পক্ষ থেকে।

মুতার প্রান্তরে মুখোমুখি হলো উভয় দল। শুরু হলো ভয়ানক লড়াই। রোমানদের লক্ষাধিক সৈন্যের দুর্ধর্ষ বাহিনীর সামনে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে লড়াই করছেন মাত্র তিন হাজার মুসলিম সৈন্য। অস্ত্র-শস্ত্রেও মুসলমানরা রোমানদের চেয়ে দুর্বল। কিন্তু মুতার প্রান্তরে সেদিন ঘটে গেল বিস্ময়কর এক উপাখ্যান। পৃথিবীর ইতিহাসে রচিত হলো এক নয়া দাস্তান। মুসলমানদের মাত্র তিন হাজার সৈন্য শক্তিশালী রোমানদের লক্ষ্য সৈন্যকে রীতিমতো নাকানি-চুবানি খাইয়ে দিচ্ছে। মুসলমানদের সাহসিকতা ও যুদ্ধের দক্ষতা দেখে রোমান সৈন্যরা বিস্ময়ে হতবাক। রোমানরা যেখানে ভেবেছে, সামান্য লড়াইয়ে উড়িয়ে দেবে মুসলমানদের, সেখানে তারা তৈরি করেছে দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

মুতার প্রান্তরে দুই পক্ষের মধ্যে চলছে তুমুল লড়াই। মুসলমানদের পতাকা সেনাপতি হযরত যায়েদ ইবনে হারেসার হাতে। এক হাতে পতাকা আর

অপর হাতে তরবারি হাতে তিনি ঢুকে পড়েন শত্রুদের ভেতর। শাহাদতের তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে ওঠেন মুসলিম সেনাপতি হযরত যায়েদ। তার চোখের সামনে যেন বারবার ভেসে উঠছে প্রতিশ্রুত বেহেশত। জীবনের কথা ভুলে গেলেন তিনি।

মুতার প্রান্তরে হযরত যায়েদ বিন হারেসা যে অসীম বীরত্ব দেখিয়েছেন ইতিহাসে তার জুড়ি মেলা ভার। শত্রুকে আঘাত করে করে সম্মুখে এগিয়ে যাচ্ছেন। তার তরবারির আঘাতে একের-পর-এক ধরাশায়ী হতে থাকে রোমান সৈন্য। তিনি যখন শত্রুদের গর্দানে তরবারি চালাচ্ছেন তখন এক শত্রু প্রচণ্ড শক্তিকে আঘাত করে। রক্তে ভেসে যায় মুসলিম সেনাপতির শরীর। অস্ফুট স্বরে কালিমা পড়তে পড়তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন হযরত যায়েদ বিন হারেসা রা.। পান করেন শাহাদতের অমীয় সুধা।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা অনুযায়ী যুদ্ধের পতাকা হাতে তুলে নেন হযরত জাফর রা.। এক হাতে পতাকা, আরেক হাতে তরবারি নিয়ে তিনিও প্রাণপন লড়ে যাচ্ছেন রোমানদের বিরুদ্ধে। লড়াই করতে করতে অবশেষে তিনিও শহিদ হয়ে গেলেন।

এবার পতাকা হাতে তুলে নেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা.। অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করতে করতে তিনিও দুই সেনাপতির সাথে মিলিত হলেন। মুতার প্রান্তর ভেসে গেল হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার রক্তে।

রণাঙ্গনে মৃত্যু হয় যার, তার জীবন তো আসমানের। আত্মোৎসর্গের অপার্থিব ঝরনায় সিক্ত হলেন ইসলামের তিন সাহসী সেনাপতি।

একে একে তিনজন সেনাপতি শাহাদতবরণ করলেন। মুসলমানরা এবার সেনাপতি নির্বাচন করলেন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ—ইতিহাসের এক রণবীরের নাম।

মহাকালের মহানায়ক তিনি।

তিনি রণাঙ্গনের স্বর্ণঈগল।

অপরাজেয় সেনাপতি।

সর্বকালের বীরশ্রেষ্ঠদের একজন হযরত খালিদ। ইতিহাস গর্ব করে আজও তার নাম উচ্চারণ করে। এ নাম উচ্চারণ করামাত্র মুমিনের হৃদয় ও রক্তে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। ফুলে ওঠে সাহসের প্রতিটি শিরা-উপশিরা।

যুদ্ধের পতাকা হাতে নিলেন সেনাপতি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.। যুদ্ধের নতুন ছক আকঁলেন তিনি। সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে কঠিন

প্রতিরোধ গড়ে তুলেন রোমানদের বিরুদ্ধে। লক্ষ রোমান সেনার বিরুদ্ধে তিন হাজার মুজাহিদ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

ঘোড়ার পিঠে চড়ে বাতাসের মতো ক্ষিপ্রগতিতে তিনি এগিয়ে যান কাফেরদের সম্মুখে। সাহাবায়ে কেরাম ছুটছেন তার পেছনে পেছনে। মুসলমানরা যখন জীবনের মায়া ভুলে তলোয়ার উঁচু করে রোমান কাফেরদের ধাওয়া করল, তখন এক অলৌকিক ভয় রোমানদের হৃদয়কে কাঁপিয়ে তুলে। জীবন বাঁচাতে পেছনের দিকে ছুটতে থাকে তারা। রোমান সেনাপতি সৈন্যদের ডাকতে থাকে; কিন্তু সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই তাদের। প্রাণ বাঁচাতে তারা উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে থাকে। সেনাপতি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. মুসলিম সৈন্যদের নিয়ে ঢুকে পড়েন রোমান বাহিনীর ভেতর। তীব্রভাবে মুসলমানরা তরবারি চালাতে থাকে। দিশেহারা হয়ে পড়ে শত্রুর দল। তখন বহু সৈন্য হতাহত হয়। রোমানদের রক্তে ভেসে যায় মুতার প্রান্তর।

আল্লাহ বিজয় দান করলেন মুসলমানদের। মুতার প্রান্তরে রচিত হলো ইতিহাসের অমর বিজয়কাব্য। সেদিন পৃথিবী চিনল এক নতুন সেনাপতিকে। এক নতুন মহানায়ককে। তিনি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.। তার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন ছিল, যেন জিহাদের ময়দানে শহিদি মৃত্যু হয় তার। কিন্তু এমন কোনো বীর বাহাদুরের জন্ম হয়নি যে হত্যা করবে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-কে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম দিয়েছিলেন সাইফুল্লাহ তথা আল্লাহর তরবারি। আল্লাহর তরবারি ভাঙতে পারেনি কেউ কোনোদিন।

মক্কা বিজয় ও খালিদ বিন ওয়ালিদ রাঃ

কাফেরদের অত্যাচারে একদিন মুসলমানরা মাতৃভূমি ছেড়ে মদিনায় হিজরত করে। ধীরে ধীরে মুসলমানরা শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। ৮ম হিজরিতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের ইচ্ছা করলেন। রাসুলের নির্দেশে সাহাবায়ে কেরাম যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। হকের বাহিনী এগিয়ে চলছে মক্কা অভিমুখে। আজ সঙ্গে আছেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কাফেরদের সাথে মুসলমানদের আজ চূড়ান্ত সংঘাত হবে। দূর থেকে মুসলমানদের আগমন দেখে মক্কাবাসী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ভেতরে ভেতরে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এককালে মক্কার দুর্দণ্ড প্রতাপ থাকলেও ততদিনে

খর্ব হয়ে এসেছে তাদের শক্তি-সামর্থ্য। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো সাহস ও প্রস্তুতি তাদের ছিল না। তাই তারা আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। কিন্তু কতিপয় পাপিষ্ঠ তারা কিছুতেই মুসলমানদের বিনা বাধায় মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। সংখ্যায় ছিল তারা নিতান্তই স্বল্প। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের জিঘাংসা এতই প্রগাঢ় যে, কিছুতেই তারা মুসলমানদের ফের মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। মুসলিম বাহিনীকে প্রতিহত করতে তারা এগিয়ে আসে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে প্রেরণ করলেন তাদের মুকাবেলা করার জন্য। নবীজি জানতেন, খালিদই তাদের জন্য যথেষ্ট। হযরত খালিদ অসীম সাহসে এগিয়ে গেলেন তাদের দিকে। মক্কার কাফেরদের হযরত খালিদ একাই ধরাশায়ী করেন। তাদের ক-জনকে তিনি হত্যা করেন। আর ক-জন জান নিয়ে পালিয়ে যায়।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন,

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ

> 'আমি সত্য দ্বারা মিথ্যার ওপর আঘাত করি; সত্য তখন মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় আর তখনই মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে যায়। তোমরা যা বলছ তার কারণে তোমাদের জন্য রয়েছে বড় দুর্ভোগ।' [৯৩]

মক্কা বিজয় হলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন। সেই মক্কা, যা ছিল তাদের জন্মভূমি। যেখান থেকে একদিন তারা হিজরত করেছিলেন মদিনায়।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. ছিলেন সেসব মহান সাহাবায়ে কেরামের মধ্য থেকে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মানের ঘোষণা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন,

---

৯৩ সুরা আম্বিয়া: ১৮

لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى

'তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে তারা অন্যদের সমান নয়। মর্যাদায় এরা তাদের চেয়ে বড়, যারা পরে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ প্রত্যেককে কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।'[৯৪]

রাসুলের মৃত্যু-পরবর্তী সৃষ্ট ফেতনার মোকাবেলা

একাদশ হিজরি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করলেন। রাসুলের তিরোধানের পর ইসলাম সম্মুখীন হলো ভয়াবহ সঙ্কটের। মুসলমানদের ওপর নেমে এলো ঘোরতর বিপদ। এতদিন পর্যন্ত ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ হতো। সবকিছু তাই সকলের জন্য সহজ ছিল। কিন্তু তিনি চলে গেলেন রফিকে আলার সান্নিধ্যে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! এ হলো মৃত্যু। এর থেকে কেউ পলায়ন করতে পারবে না। দুনিয়াতে যার আগমন হয়েছে তাকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে। এ চিরসত্য। পৃথিবীর অমোঘ বিধান। চাই তিনি নবী বা রাসুল হোন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর দেখা দিলো নতুন ফিতনা। ইতিহাসে যা ফিতনায়ে ইরতিদাদ নামে প্রসিদ্ধ। মুসলমানরা চতুর্দিকে মুরতাদ হয়ে যেতে লাগল। অপরদিকে মুসায়লামা নিজেকে নবী দাবি করল। নতুন ও সরলমনা মুসলমানদের মুসায়লামা ইসলাম থেকে বিচ্যুত করতে লাগল। তার গোত্রের সকলে তাকে নবী হিসেবে মেনে নিয়ে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে গেল। অন্যদিকে সরলমনা একদল মুসলমানরা

---

৯৪ সুরা হাদিদ: ১০

যাকাত দিতে অস্বীকার করল। যাকাত ইসলামের অন্যতম রুকন। ইসলামের ভিত্তি রাখা হয়েছে যে কয়টি বিধানের ওপর, তন্মধ্যে একটি হলো যাকাত। মুসলমানদের খলিফা তখন হযরত আবু বকর রা.। ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য ভয়াবহ এ ফেতনাকে মূলোৎপাটন করার জন্য খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত আবু বকর রা. অত্যন্ত কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। দ্ব্যর্থ কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, ইসলামের ক্ষতি হবে আর আমি আবু বকর বেঁচে থাকব?

হযরত আবু বকর রা. তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা পর্যন্ত দিলেন। যিনি ছিলেন কোমল, ইসলামের সঙ্কট মুকাবলোয় তিনি হলেন শক্ত পাথর। যিনি ছিলেন বৃষ্টির মতো শীতল, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের সম্মান রক্ষার্থে তিনি ধারণ করলেন বজ্রকঠিন। সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করলেন। বললেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর তার ধর্মকে পরিবর্তন করা হবে—এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধে আমরা অস্ত্রধারণ করব।

ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর এ দুর্দিনে হযরত আবু বকর রা. অত্যন্ত সময়োপযোগী ভূমিকা পালন করেছেন। রাসুলের ইন্তেকালের পর ইসলামের ওপর আগত ধাক্কা সামাল দেওয়ার জন্য একজন আবু বকরের প্রয়োজন ছিল। এ উম্মতের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, আল্লাহ তায়ালা প্রতি একশ বছরে এ উম্মতের মাঝে একজন মুজাদ্দিদ প্রেরণ করবেন। হযরত আবু বকর রা. হলেন প্রথম মুজাদ্দিদ। যার অপরিসীম ত্যাগে ইসলাম তার সঠিক পথে অটল ছিল। সে সময় হযরত আবু বকর রা.-এর সিদ্ধান্ত ছিল যে-কোনো মূল্যে ইসলামকে সাহায্য করতে হবে। কিছুতেই রাসুলের রেখে যাওয়া শরিয়তের মাঝে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা যাবে না। এমনকি রাসুলের একটি সুন্নতের সাথেও আপস করা যাবে না।

তাদের ক্ষেত্রেই আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

'যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো তাহলে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তিনি তোমাদের অটল ও অবিচল রাখবেন।'[৯৫]
ভণ্ডনবী দাবিদার মুসাইলামা ও তার অনুসারীদের দমন করতে কোমল খলিফা রূঢ় হলেন। ফুলের মানব হলেন শক্ত পাথর। জ্বলে উঠলেন ইসলামের চেতনায়। ভণ্ডনবী মুসাইলামাকে নির্মূলে কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। মুসাইলামা ও তার দোষরদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সংবাদ আসতে থাকে খলিফার কানে। পেরেশান হয়ে ভাবতে থাকেন কী করা যায়। দেখলেন, যুদ্ধ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা নেই। যুদ্ধই একমাত্র সমাধান। সুতবাং যুদ্ধ অনিবার্য। খলিফা হযরত আবু বকর রা. যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন ভণ্ডনবী দাবিদারদের অন্যতম পাষণ্ড মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের বিরুদ্ধে। খলিফার নির্দেশে তৈরি হলো মুসলিম বাহিনী। যুদ্ধের সেনাপতি নিযুক্ত করলেন তিনি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-কে।

মুসলিম বাহিনী নিয়ে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. রওনা করলেন ইয়ামামার প্রান্তর। সেনাপতি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. মুসলিম বাহিনীকে সুসজ্জিত করলেন। মুসলিম বাহিনীকে তিনি সিসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করালেন। মুখোমুখি হলো দুই বাহিনী। ভণ্ডনবী ও তার ভণ্ড অনুসারীদের সাথে সত্যনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীদের যুদ্ধ। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার লড়াই। এ যুদ্ধ মিথ্যাকে পরাজিত করার। অন্ধকার দূরীভূত করে আলো জ্বালানোর এক গুরুত্বপূর্ণ সংঘাত। বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা। দু-পক্ষের তীব্র আক্রমণে কেঁপে-কেঁপে উঠছে ইয়ামামার প্রান্তর। তরবারির ঝলকানিতে ঝলসে উঠছে তীব্র রোদ। পাথর খণ্ডের সাথে ঘোড়ার পদাঘাতে সৃষ্টি হয়েছে ভয়ানক শব্দের। লড়াই তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। মুসাইলামা তার সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে। কেননা মুসাইলামা জানে,আজ যদি হেরে যায়, তাহলে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে তার নবী হওয়ার বাসনা।

এ উম্মতের প্রথম মুজাদ্দিদ হযরত আবু বকর রা. ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও সীমাহীন প্রজ্ঞার অধিকারী। সর্বোপরি নবীজির তিরোধানের পর এই প্রথম বড় কোনো অভিযান। তাই অধিকতর সাহসী ও বিচক্ষণ যোদ্ধা হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে সেনাপতি বানিয়ে প্রেরণ করেন শক্তিশালী কাফেলা।

---

৯৫ সুরা মুহাম্মদ: ৭

মুসলিম বাহিনীর চেষ্টা ছিল প্রাণান্ত। মরণপণ তারা লড়ে যাচ্ছেন। যুদ্ধ চলছে তুমুল তুফানে। ক্ষিপ্রগতিতে মুসলিম সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ে কাফেরদের ওপর। তীব্র লড়াই চলছে। যুদ্ধের প্রারম্ভে উভয় পক্ষ ছিল সমানে সমান। কেউ ছাড় দিতে রাজি নয় আজ। না মুসলিম বাহিনী। না মুসাইলামার দল। এ লড়াই নিছক জয়-পরাজয়ের লড়াই নয়; সত্য ও মিথ্যা নিরূপণের এক চূড়ান্ত যুদ্ধ। যুদ্ধের মাঝেই সেনাপতি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ নিজ ঘোড়ার ওপর দাঁড়িয়ে তেজস্বী কণ্ঠে মুসলিম বাহিনীকে উদ্দেশ্য করে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। তিনি বলেন, 'হে মদিনার অধিবাসীগণ! আজ তোমরা অন্তর থেকে মদিনার চিন্তা মুছে ফেলো। আজ তোমাদের অন্তরে শুধু আল্লাহ এবং জান্নাতের স্মরণ থাকা উচিত। আজকের এ লড়াই পার্থক্য করবে সত্য ও মিথ্যার।'

সেনাপতি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর এমন অগ্নিময় ভাষণ শুনে দ্বিগুণ শক্তিতে জ্বলে ওঠে মুসলিম বাহিনী। তাদের রক্তে বলখ মেরে ওঠে সাহস ও শৌর্যের আগুন। অসীম প্রেরণায় মুসলিম বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুদের ওপর। মরণঘাতী লড়াই চলছে ইয়ামামার প্রান্তরে। যুদ্ধ ক্রমশ চূড়ান্ত মুহূর্তে প্রবেশ করছে। নাঙা তলোয়ার উঁচিয়ে ঘোড়া ছুটিয়েছেন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ ও তার অনুগত বাহিনী। মুসলমান বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ে মুসাইলামার বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। অবশেষে মুসলমানদের প্রতিহত করতে না পেরে তারা তাদের দূর্গের ভেতর চলে যায়। ভণ্ডনবী ঘাতক মুসাইলামা দূর্গের ভেতর আত্মগোপন করে। শত্রুপক্ষ পিছু হটলেও সেনাপতি হযরত খালিদ থেমে যাননি। আজ তিনি একটি চূড়ান্ত রফাদফা করে তবেই যাবেন ইয়ামামার প্রান্তর থেকে। যে ইচ্ছা সে কাজ। মুসলমান বাহিনী দূর্গের ভেতর আক্রমণ চালায়। মুসলমানদের সাহসী অভিযানে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় মুসাইলামা বাহিনী। মুসলমানদের হাতে অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে নিহত হয় মুসাইলামা। বীরের বেশে মুসলিম বাহিনী মদিনায় ফিরে আসে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর সংঘটিত প্রথম যুদ্ধে মুসলমানরা হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে বিপুল বিজয় অর্জন করে। ইয়ামামার ধূসর প্রান্তরে সেনাপতি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের অসীম সাহসিকতা ও প্রশংসনীয় বীরত্ব ইতিহাসে লেখা আছে স্বর্ণাক্ষরে।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন,

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

'অতঃপর কাফেরদের সাথে যখন তোমাদের মোকাবেলা হবে তখন তাদের গর্দানে আঘাত করবে। অবশেষে যখন তোমরা তাদের রক্তপাত ঘটাবে তখন শক্তভাবে বাঁধবে। তারপর হয় অনুকম্পা করবে নাহয় মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের ছেড়ে দেবে। যতক্ষণ না যুদ্ধ তার বোঝা নামিয়ে রাখে। এটাই আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ চাইলে তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন, কিন্তু তিনি চান তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে। যারা আল্লাহর পথে শহিদ হয় তাদের কর্ম তিনি কিছুতেই নষ্ট করবেন না। এবং তাদের সেই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার কথা তিনি তাদের জানিয়েছেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য করো তাহলে তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা তথা অবস্থান সুদৃঢ় রাখবেন।'[৯৬]

---

৯৬ সুরা মুহাম্মদ: ৪-৭

ফের নতুন যুদ্ধের ডাক

খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত আবু বকর রা. তখন দারুণ বিচক্ষণতার সাথে পরিচালনা করছেন খেলাফতের মসনদ। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ইসলামের প্রচার-প্রসার ও ইসলামকে বিজয় করার লক্ষ্যে খলিফাতুল মুসলিমিন নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করতে লাগলেন। তৎকালীন পৃথিবীর দুই পরাশক্তি হলো পারস্য ও রোম। যারা দুনিয়াকে শাসন করছিল প্রবল প্রতাপে। খলিফা চিন্তা করলেন, পারস্য ও রোম সাম্রাজ্য অন্তর্গত বিভিন্ন শহরে সাহাবায়ে কেরামকে প্রেরণ করবেন। তারা প্রথমে তাদের ইসলামের দাওয়াত দেবেন, যদি তারা ইসলামের দাওয়াত কবুল না করে তাহলে ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করতে বলবেন। যদি তাও না করে তাহলে তাদের সাথে মুসলমানদের ফায়সালা হবে তরবারির। এটিই ইসলামের নীতি। ইসলাম প্রথমেই কাউকে আঘাত করে না। প্রথমে তাদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হবে। বলা হবে ইসলাম গ্রহণ করতে। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে বলা হবে মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করতে। ইসলামী সাম্রাজ্যে কর ও জিযিয়া প্রদান করতে। যদি কোনোটিই না মেনে নেয় তাহলে তখন তাদের সাথে লড়াই হবে।

খলিফা হযরত আবু বকর রা. ইসলামের ইতিহাসের অকুতভয় সেনানায়ক সাহাবি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-কে পারস্য অভিমুখে প্রেরণ করেন। সাহাবায়ে কেরাম ও মুসলমানদের একটি বাহিনী নিয়ে হযরত খালিদ রওনা হলেন পারস্য অভিমুখে। খলিফাতুল মুসলিমিন এখানে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-কে নির্বাচন করেছেন। কারণ তার সাহসিকতা ও বীরত্ব ছিল প্রশংসনীয়। রণাঙ্গনে শত্রুপক্ষকে তিনি নাস্তানাবুদ করেন। ক্ষতবিক্ষত করেন। শত্রুপক্ষের ব্যূহ ভেদ করে তিনি পৌঁছে যান অভীষ্ট লক্ষ্যে। যুদ্ধের ময়দানে তিনি হন বিজয়ী। তার যুদ্ধ কৌশল প্রখর। ইয়ামামার প্রান্তরে তার নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী শত্রুপক্ষকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছে। হযরত আবু বকর রা. তাই শক্তিশালী পারসিকদের বিরুদ্ধে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-কেই নির্বাচিত করেছেন সেনাপতি হিসেবে।

সেনাপতি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ তার বাহিনী নিয়ে ইরাকে পৌঁছেন। সেখানে গিয়ে তিনি শাসকদের নিকট ইসলামের দাওয়াতসম্বলিত পত্র প্রেরণ করেন। তাতে লেখা ছিল,

من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فله ما لنا، وعليه ما علينا، وإلا فإني أتيتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة، ويرغبون في الآخرة كما ترغبون أنتم في الدنيا

'যারা নামাজ আদায় করে, আমাদের কেবলাকে কেবলা বলে স্বীকার করে এবং আমাদের জবাইকৃত পশু খায় তারা আমাদের জিম্মায়। তাদের কোনো ক্ষতি করা হবে না। এছাড়া আর যারা রয়েছে তারা শোনে রাখো! আমরা আসছি তোমাদের নিকট। তোমাদের নিকট জীবন যেমন প্রিয় আমাদের নিকট মৃত্যু তেমনই প্রিয়। তোমাদের নিকট দুনিয়া যেমন প্রিয় আমাদের নিকট আখেরাত তেমনই প্রিয়।'

মুসলিম সেনাপতি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর চিঠির সারমর্ম হলো, যারা মুসলমান এবং ইসলাম গ্রহণ করেছে। যারা ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করে নেবে তাদের জীবন ও মাল আমাদের নিকট নিরাপদ। তাদের আমরা কিছুই করব না। আর যারা ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করবে না তাদের সাথে আমাদের সমাধান হবে তরবারির মাধ্যমে। এ চিঠির মাধ্যমে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. পারসিকদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন। এবং দাওয়াত গ্রহণ না করলে তাদের পরিণতি কী হবে সেদিকেও তিনি স্পষ্ট ভাষায় ইঙ্গিত করেছেন।

ইরাকের বেশ কয়েকটি অঞ্চল হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. তার নিপুণ সাহসিকতা ও অসাধারণ বীরত্বে জয় করেন। বিজিত সেসব অঞ্চলের মানুষজন ইসলাম গ্রহণ করে। মুসলমানগণ তখন যেদিকেই গিয়েছেন আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাদের বিজয় দান করেছেন। কেননা, মুসলমানদের তিনি বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আজ পৃথিবীর দিকে দিকে মুসলমান লাঞ্ছিত ও অপদস্থ। দেশে দেশে তারা মার খাচ্ছে কাফের মুশরিকদের হাতে। নারী ও শিশুদের আর্তনাদে আজ মুসলিম দেশের আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে

উঠেছে। চতুর্দিকেই আজ মুসলমানদের অধঃপতন। যে আল্লাহ মুসলমানদের অতীতে বিজয় দান করেছেন তিনি আজও আছেন। আজও রয়েছে তার প্রতিশ্রুতি। কিন্তু মুসলমানরা নেই সেই পূর্বের মুসলমান। তাদের ঈমানের শক্তি নিস্তেজ হয়ে গেছে। তাদের অন্তরের আলো নিভে গেছে। তাদের সততা ও চরিত্র হারিয়ে গেছে। হ্যাঁ, আজও বিজয় আসবে মুসলমানদের। যদি তারা পূর্বের সে ঈমান লাভ করতে পারে। যদি তারা সাহাবায়ে কেরামের মতো উত্তম চরিত্র ধারণ করতে পারে। যদি তাদের অন্তরে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস বিদ্যমান থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ

> 'আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর আল্লাহ তার প্রতিশ্রুতির বিপরীত করেন না। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।'[৯৭]

অতঃপর খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত আবু বকর রা. খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-কে নির্দেশ দিলেন শাম অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করার জন্য। শাম তখন অত্যন্ত শক্তিশালী শহর। দুর্ভেদ্য তাদের দূর্গ। শাম বিজয় করা তাই খুব সহজ কথা নয়। খলিফা হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে শামে অভিযানের জন্য উপযুক্ত মনে করলেন। কারণ, মুসলিম বাহিনীর অপরাজেয় সেনাপতি তিনি। সেনাপতি হিসেবে তার দক্ষতা সকলের চেয়ে অগ্রগণ্য। যুদ্ধের ময়দানে তার দারুণ বিচক্ষণতা মুসলমানদের বিজয়কে ত্বরান্বিত করে। সুতরাং অভেদ্য নগরী শাম বিজয় করার জন্য খালিদই অধিকতর উপযুক্ত।

খলিফার নির্দেশে তিনি হযরত মুসান্না রা.-কে ইরাকের বিজিত অঞ্চলসমূহের গভর্নর নিযুক্ত করে শামের দিকে রওনা হলেন। অল্প সময়ে তিনি পৌঁছে যান শামে। শামে পৌঁছে তিনি মুসলিম বাহিনীর উদ্দেশ্যে অত্যন্ত সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন। তাদের তিনি শাহাদতের ওপর উদ্বুদ্ধ করেন। জিহাদের ফজিলত বর্ণনা করে তিনি মুসলিম বাহিনীর মনোবল দ্বিগুণ করার চেষ্টা করেন। তাদের অধিকতর আত্মনিবেদিতরূপে প্রস্তুত করেন। তার জাগরণী ভাষণে

---

৯৭ সুরা রূম: ৬

মুসলিম বাহিনী নতুন প্রেরণায় জেগে ওঠে। তাদের হৃদয় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তাদের ধমনীতে বয়ে যায় শাহাদতের রক্ত। আল্লাহর রাহে জীবন উৎসর্গের জন্য তারা সর্বাঙ্গীন প্রস্তুতি গ্রহণ করে। মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা তেমন অধিক ছিল না। নিয়ম অনুযায়ী মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের আগের রাতে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। দীর্ঘ সময় তারা নামাজ আদায় করেন। কুরআন তিলাওয়াত করেন। কাকুতি-মিনতি করে আল্লাহর সাহায্য কামনা করেন। কেননা, মুসলমানদের সাহায্য তো একমাত্র তার পক্ষ থেকেই আসে। মুসলমান কখনো নিজেদের সৈন্য ও অস্ত্রবলের ওপর ভরসা করে না। তাদের সাহায্য আসে আসমান থেকে। মুসলমানদের বিজয় লেখা হয় আরশে। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন,

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ
بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ

> 'যখন তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছিলে এবং তোমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে তিনি বলেছিলেন, আমি তোমাদের এক হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে সাহায্য করব যারা একজনের পেছনে আরেকজন ক্রমান্বয়ে আসতে থাকবে।'[৯৮]

আজকের শত্রুদের নিকট রয়েছে বড় বড় কামান এবং শক্তিশালী বহু অস্ত্র। তাদের নিকট রয়েছে পারমাণবিক অস্ত্রের অত্যাধুনিক সরঞ্জাম। মুসলমানদের নিকট এসবের কিছু নেই। কিন্তু মুসলমানদের রয়েছে আল্লাহর সাহায্য। রয়েছে প্রভুর নিযুক্ত অসংখ্য ফেরেশতা। তারা আল্লাহর নির্দেশে আসমান থেকে জমিনে নেমে আসবে মুমিনদের সাহায্য করতে। শুধু প্রয়োজন মুসলমানদের ঈমানি শক্তি বৃদ্ধি করা। আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য করা। আল্লাহকে ভয় করা। তাহলে কে আছে মুসলমানদের পরাজিত করার। কে আছে মুসলমানদের যুদ্ধক্ষেত্রে পরাস্ত করবে? আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা সর্বক্ষেত্রে মুসলমানদের সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছেন। মুসলমানদের মানসিক অবস্থাকে সুদৃঢ় রাখার জন্য আল্লাহ তাদের দিয়েছেন অফুরন্ত সুসংবাদ। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন,

---

৯৮ সুরা আনফাল: ৯

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ

'তোমরা শত্রুর সামনে দুর্বল কিংবা বিষণ্ন হয়ো না। প্রকৃত ঈমানদার হলে তোমরাই বিজয় হবে। যদি তোমাদের কোনো আঘাত আসে তাহলে মনে করো অনুরূপ আঘাত তো অন্যদেরও লেগেছে। আর এই দিনগুলো আমি মানুষের মধ্যে অদলবদল করি; যাতে আল্লাহ মুমিনদের যাচাই করতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে শহিদদের গ্রহণ করতে পারেন। আর আল্লাহ জালেমদের ভালবাসেন না। আর এ কারণে আল্লাহ ঈমানদারদেরকে পাক-সাফ করতে চান এবং কাফেরদেরকে ধবংস করে দিতে চান।' [৯৯]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

'তোমরা কি মনে করো যে, জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমাদের পূর্বে যারা চলে গেছে তাদের মতো অবস্থা তোমাদের এখনো আসেনি। তারা অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্টের কবলে পড়েছিল এবং ভয়ে এমনভাবে কম্পিত হয়েছিল যে, রাসুল ও তার সঙ্গী ঈমানদারগণ বলেছিল,

---

৯৯ সুরা আলে ইমরান: ১৩৯-১৪১

কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে? জেনে রেখো! আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।'[১০০]

অতঃপর সকাল হলো। রাতভর ইবাদত ও আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে মুসলিম বাহিনী সাহায্য প্রার্থনা করেন। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা মুসলিম বাহিনীর ডাকে সাড়া দিয়েছেন। সকালে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলো। আল্লাহু আকবার! সময় বেশি দূর গড়ায়নি। বিজয় মুসলমানদের চুম্বন করেছে। কে ভেবেছিল এমন একটি ছোট্ট দল শাম বাহিনীর সাথে লড়াইয়ে পেরে ওঠবে? কেউ ভাবেনি। শত্রুপক্ষ কল্পনাও করতে পারেনি মদিনার মুসলিম বাহিনী তাদের পরাজিত করবে। কিন্তু আল্লাহ মুসলমানদের বিজয় দান করলেন। আর প্রকৃতার্থে তিনি তো মুসলমানদের বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেনই। যুদ্ধ সমাপ্ত হলো। বিজয়ী বেশে মুসলিম সেনাপতি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. শত্রুপক্ষের সেনাপতির তাবুতে নামাজ আদায় করলেন। ইসলামের আরো একটি বিজয় অর্জিত হলো হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. এর নেতৃত্ব ও অপরিসীম বীরত্বে। ইরশাদ হয়েছে,

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ

'আমার প্রেরিত বান্দাদের জন্য আমার কথা আগেই ঠিক হয়ে গেছে। তারা অবশ্যই সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। এবং আমার সৈনিকেরাই বিজয়ী হবে।' [১০১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

. كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

আল্লাহ লিখে দিয়েছেন, আমি ও আমার রাসুলগণ অবশ্যই বিজয়ী হবো। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর ও পরাক্রমশালী।'[১০২]

---

১০০ সুরা বাকারা: ২১৪

১০১ সুরা সাফফাত: ১৭১-১৭৩

১০২ সুরা মুজাদালা: ২১

সেনাপতির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির কারণ

হযরত আবু বকর রা.-এর ইন্তেকালের পর খলিফাতুল মুসলিমিন নির্বাচিত হলেন হযরত উমর রা.। খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-কে সেনাপতির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন। তার স্থলে সেনাপতি নিযুক্ত করেন হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রা.-কে। হযরত উমর রা. খেলাফতের মসনদে বসে কেন অপরাজেয় সেনাপতি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-কে সেনাপতির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিলেন? অথচ তিনি প্রতিটি যুদ্ধে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করে মুসলমানদের একের-পর-এক বিজয় উপহার দিয়েছেন। কে আছে এমন যে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর তরবারিকে ভেঙে দেবে? আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তরবারি) উপাধি দিয়েছেন।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-কে সেনাপতির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার কারণ হযরত উমর রা. নিজেই বর্ণনা করেছেন। আল্লাহু আকবার! কী ছিল সে কথা, যা হযরত উমর রা. বলেছেন?

ما عزلت خالداً عن سخطة ولا عن خيانة، ولكني
رأيت الناس قد فتنوا بـ خالد، فأردت أن يعلم الناس أن
النصر من عند الله الصانع وليس من عند خالد

'আমি ক্রোধ কিংবা খেয়ানতের বশবর্তী হয়ে খালিদকে সেনাপতির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিইনি। কিন্তু আমি দেখেছি, লোকেরা খালিদের ব্যাপারে ফিতনায় পতিত হচ্ছে। আমি চেয়েছি লোকদের এ কথা জানাতে যে, মুসলমানদের বিজয় আসে একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে, খালিদের পক্ষ থেকে নয়।'

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. ছিলেন এমন এক বীর যে, লোকেরা মনে করতে লাগল, যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় অর্জিত হয় খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর শক্তি ও নিপুণ বুদ্ধিতে। লোকেদের মনে এ কথা বদ্ধমূল হয়ে গেল,

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদই মুসলমানদের বিজয়ের কারণ। অথচ মুসলমানদের বিজয় কোনো শক্তি আর সৈন্যবলে নয়, মুসলমানদের বিজয় আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। তাদের এ ধারণার মূলোৎপাটন করার লক্ষ্যে হযরত উমর রা. খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-কে সেনাপতির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন।

হে মুসলিম যুব ও তরুণ প্রজন্ম! হে ইসলামের প্রাণশক্তি তরুণ প্রজন্ম! তোমরা হবে খালিদের অনুসারী। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. হবেন তোমাদের নেতা। তোমরা পদাঙ্ক অনুসরণ করবে তাদের যারা উম্মাহর বিজয়ের পথ রচনা করে গেছেন। তোমাদের আইকন হবে তারা যাঁদের রক্তে সিঞ্চিত হয়েছে ইসলাম নামক বৃক্ষ। মুসলিম যুবকদের আইকন কোনো ফাসেক ফাজের নায়ক ও প্লেয়াররা নয়, মুসলিম তরুণদের আইকন হবেন সাহাবায়ে কেরাম। মুসলিম তরুণ প্রজন্ম অনুসরণ করবে খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. ও তার সঙ্গীদের। হে তরুণ! হে যুবক! তোমাদের হতে হবে উম্মাহর উমর, খালিদ, আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রা.দের মত। তোমাদের হতে হবে উম্মাহর অতন্দ্র প্রহরী। ইসলামের বিজয় পথ তৈরি করতে হবে তোমাদের। এ জাতির কান্ডারি তোমরাই। আল্লাহর জমিনের আল্লাহর কালিমা বুলন্দি করার জন্য তোমাদের এগিয়ে আসতে হবে সময়ের খালিদ বিন ওয়ালিদ হয়ে।

আজ দিকে দিকে তাকিয়ে দেখো মুসলমানরা নির্যাতিত হচ্ছে। মুসলিম নারী-শিশুদের আহাজারিতে ভারী হয়ে উঠেছে পৃথিবীর আকাশ। উত্তাল সমুদ্রের তরঙ্গে ভাসছে মুসলমানের লাশ। আজ জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে মুসলমানদের। পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে মুসলমানদের রক্তে ভেসে যাচ্ছে মানচিত্র। কুফরি শক্তির হাত থেকে তাদের রক্ষা করার ঈমানি দায়িত্বে তোমাকেই এগিয়ে আসতে হবে। আল্লাহর কসম! আজ মুসলমানরা তাকিয়ে আছে তোমাদের পানে। তোমাদের ডাকছে আহাজারি করে। তোমাদের এগিয়ে আসার জন্য তারা প্রার্থনা করছে আল্লাহর দরবারে। হে উম্মাহর তরুণ প্রজন্ম! হে উম্মাহর তরুণ শক্তি! হে উম্মাহর সৈনিক! তোমরা এগিয়ে আসো জমানার খালিদ বিন ওয়ালিদ হয়ে। জুলুম ও নিপীড়ন থেকে তাদের মুক্ত করো। পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা করো আল্লাহর দ্বীন। যে দ্বীন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমানতস্বরূপ রেখে গেছেন তোমাদের নিকট।

প্রার্থনা করি, আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা যেন আমাদের হৃদয়কে জীবন্ত করে দেন। এবং আমাদের সৎপথে পরিচালিত করেন। ভ্রষ্টতা ও গোমরাহি থেকে হেফাজত করেন। মুসলিম উম্মাহর তরুণ প্রজন্মের হৃদয়কে জাগ্রত করেন। তাদের শক্তি, সাহসকে ইসলামের বিজয়ের জন্য কবুল করে নেন। আমিন।

Hasanah Publication
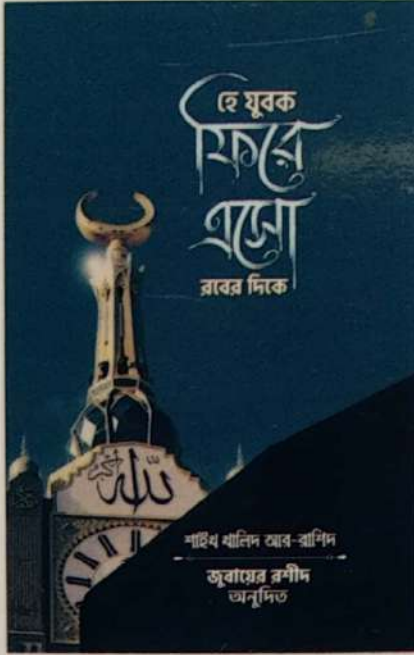
He Jobok Fire Aso Rober Dike
by Shaikh Khalid Ar-Rashid
Hasanah Publication
price: ৳২২০
+880197441172

hasanahpublication@gamil.com
fb.com/hasanahpublication

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, ওয়াফি লাইফ, একসাথেই.কম

মুসলিম তরুণ প্রজন্মকে জাগ্রত হতে হবে। নিজেদের আত্মমর্যাদাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দুনিয়ার উন্মত্ত নেশা, বস্তুবাদের লোভাতুর হাতছানি, পুঁজিবাদের অন্ধত্ব, অবাধ্যতা ও নাফরমানির জাল ছিন্ন করে ফিরে আসতে হবে ইসলামের শাশ্বত আলোয়। শক্তভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে আল্লাহর রজ্জুকে। নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করতে হবে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ। গড়ে তুলতে হবে সুন্দর পাপমুক্ত জীবন। কেননা, পাপ মানুষের ঈমানি ও নৈতিক শক্তিকে নড়বড়ে করে দেয়। শত্রুর সাথে লড়াই করে জিতবার পূর্বেই ব্যক্তিগতভাবে তাকে পরাজিত করে দেয়। আজ তাই প্রথমে প্রয়োজন তরুণ প্রজন্মের ব্যক্তিত্ব গঠন।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি মুসলিম যুব ও তরুণ প্রজন্মকে স্মরণ করিয়ে দেবে তার কর্তব্যের কথা। উম্মাহর প্রতি তার অপরিসীম দায়বোধের কথা। স্মরণ করিয়ে দেবে হারানো ইতিহাস ঐতিহ্যের কথা। এ গ্রন্থ মুসলিম তারুণ্যকে করে তুলবে অধিকতর সচেতন । তার হৃদয়ে ঈমানের সুবজ বৃক্ষ রোপণ করবে। তার চরিত্রকে করবে সুশোভিত। তার চেতনাকে করবে শানিত। চিন্তাকে করবে চৈত্রের রোদের মতো স্বচ্ছ ও প্রখর।